আর্য্যজীবন

অর্থাৎ

হিন্দু আচার ব্যবহার প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান।

প্রথম খণ্ড।

শ্রী গঙ্গাদাস বসু প্রণীত।

কলিকাতা

পটলডাঙ্গা ৪৫ বেনেটোলা লেনে, সাম্য যন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার ব্যবহার প্রভৃতির উপর লোকের মন কিছু কিছু করিয়া আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন কি দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল স্থানে পত্রিকায় এবং বক্তৃতায় হিন্দু আচার ব্যবহারাদির দোষ-কাহিনী কীর্ত্তিত হইত, আজ কাল সে সকল স্থানেও ড[illegible]খানি করিয়া পত্রিকায় এবং সময় সময় দুই একটী করিয়া বক্তৃতায় তাহার গুণ-কাহিনী ঘোষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু, নানা কারণে, বিশেষতঃ বৈদেশিক-দিগের আচার ব্যবহারাদির সংমিশ্রণে হিন্দু আচার ব্যবহারাদির যে বিকৃতি-সংঘটন হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন শিক্ষিত সমাজের যে তৎপ্রতি দারুণ বিদ্বেষভাব সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে, মাত্র দুই এক-খানি পত্রিকার দুই একটী প্রবন্ধে কিংবা দুই একজন বক্তার দুই একটী বক্তৃতায় তাহা অপনীত হইতে পারে না; তাহার অপনয়ন জন্য বহু সংখ্যক শাস্ত্রার্থসম্বলিত সুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রয়োজন সেই গ্রন্থও শুধু শাস্ত্রীয় বচনের উপর লিখিত হইলেই চলিবে না, তাহা বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল বঙ্গভাষায় শত শত প্রকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, অথচ যেরূপ গ্রন্থের উপর সমাজের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে, যাহার উপর জগন্মান্য হিন্দুজাতির নষ্টগৌরব-সমুদ্ধারের আশা ভরসা বহু পরিমাণে ন্যস্ত হইতে পারে, সেই জাতীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত একখানিও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এ সময়ে এরূপ গ্রন্থের অভাব সকলেই গাঢ়রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। এই গুরুতর অভাবের আংশিক পরি-পূরণ জন্যই আমরা সাহিত্য-জগতে আর্য্যজীবনের অবতারণা করি-লাম। কিন্তু বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এবং নূতন তাহাতে আমার

ন্যায় শাস্ত্রানভিজ্ঞ সামান্য ব্যক্তির পক্ষে উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক্, তদ্রূপ আশা করাও ধৃষ্টতার বিষয়। তবে প্রকারান্তরে আমার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারে—আমাকে এরূপ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া শাস্ত্রার্থকুশল, জ্ঞানবলসম্পন্ন মনীষিগণ ইহাতে হস্তার্পণ করিতে পারেন। কেননা, সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে, যেখানে সামর্থ্যবিহীন অনভিজ্ঞ জনকে গুরুতর কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া বলশালী প্রবীণগণ আপনাদিগের ঔদাসীনতা পরিত্যাগ করেন এবং অ[illegible]ত উদ্যম সহকারে আরব্ধ কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাহা সুসম্পাদিত করিয়া থাকেন। এখন যদি আমার এই উদ্দেশ্যও কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হয়—যদি আমার ন্যায় অযোগ্য পাত্রের হস্তে পবিত্র হিন্দু আচার ব্যবহারাদির অপব্যবহার দেখিয়া প্রবীণগণ তাহার সদ্ব্যবহারে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত যত্ন এবং পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব এবং ক্রমে ক্রমে আর্য্য-জীবনের অন্যান্য খণ্ড সকল প্রকাশিত করিতে যত্নপর হইব।

গ্রন্থকার।

নং ১৩৪

আর্য্যজীবন

উপক্রমণিকা।

"আর্য্য" এই মধুমাখা নামটীর কি গভীর ভাব! কি সম্মোহিনী শক্তি! যখনই এই সুমধুর নামটী স্মৃতি পথে সমুদিত হয় তখনই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, মন উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হৃদয়বন্ধুর প্রেমালিঙ্গনে শরীর যেমন শীতল, মন যেমন পুলকে পূর্ণ হয়, এই সুমধুর নামস্মরণে ও হৃদয় তেমনি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপতপ্ত পথিক শীতল-কণ-বাহী মারুত হিল্লোলের সুশীতল স্পর্শে যেমন আপনার পথশ্রান্তি ভুলিয়া যায়, তেমনি এই মধুময় নামের সুখময়স্মৃতিতে ক্ষণেকের জন্য একেবারে সমস্ত শোকতাপ, সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইয়া যাই। আজি ভাবুকের পবিত্র হৃদয় লইয়া যেমন এই সুধাময় নামের মাহাত্ম্য অনুধ্যান করিতে বসিলাম, অমনি যেন দিব্যচক্ষে বহুসহস্রাব্দী

নিদ্রিত আর্য্যগৌরবচন্দ্রমার সেই মনোহরকান্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে লাগিলাম। যেন দেখিতে পাইলাম, জগদারাধ্য আর্য্য পিতৃপুরুষগণ দিব্যধামে দিব্যাসনে সমাসীন হইয়া আপনাদিগের দিব্য প্রভায় জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে করুণা নয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিনি[illegible] করিতেছেন। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত দেবমূর্ত্তি সন্দর্শনে মস্তক আপনা হইতেই ভক্তিভরে তাঁহাদের পবিত্র চরণে অবনত হইল। তাঁহাদের স্নেহ বৎসল মুখশ্রী দর্শনে মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন আমাদিগকে কহিতেছেন —“বৎসগণ! তোমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি কেন? তোমরা আমাদিগেরই বংশধর; তোমাদের ধমনীতে অদ্যাপি আমাদিগেরই শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে; তবে কেন তোমরা আমাদিগের এই পবিত্র ধর্ম্ম, পবিত্র আচার ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাতমনোরম অন্তঃসারবিহীন বৈদেশিক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া আপনাদের সুখের পথ আপনারাই কণ্টকিত করিতেছ? আমরা বহুশতাব্দী ব্যাপী বহ্বায়াস-সাধ্য গবেষণার ফল-স্বরূপ যে সমস্ত অমূল্য রত্ন তোমাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি, তোমরা তাহার সমাদর না করিয়া রঙ্গিল কাচের নয়ন-ঝলসী চাক্‌চিক্যে আসক্ত হইতেছ, ইহার কারণ কি? তোমরা কি কাচ ও মণির পার্থক্য-জ্ঞান

পর্য্যন্ত বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জ্জন করিয়াছ? কালচক্রের বিচিত্র ঘূর্ণনে রত্ন রাজির ঔজ্জ্বল্য বহু পরিমাণে তিরোহিত হয় সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমান জনগণ কি সমুচিত যত্ন সহকারে তৎস মস্তকে আবর্জ্জনা-পরিমুক্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিবিশিষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবে না? নষ্টপ্রায় সম্পত্তির উদ্ধার মানসে যত্নপর হওয়া কি জ্ঞানী মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে? অতএব বৎস গণ! জাগ্রত হও, আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না। এখনও নষ্টপ্রায় মহামূল্য রত্ন গুলির উদ্ধার সাধনে যত্নপর হও। এই সাধু কার্য্যে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ তোমাদিগের সহায় হইবেন,,। কল্পনা প্রসূত এই বাক্য নিচয় যেন আমার হৃদয়ে আর অমূলক বলিয়া প্রতীত হইল না, আমি যেন সাক্ষাৎ রূপে উহার প্রত্যেক বর্ণ শ্রবন করিলাম বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। আমি যেন অমনি সেই দিব্যপুরুষ দিগের দিকে চাহিয়া গললগ্নীকৃতবাসে আপনাদিগের অতীত উদাসীনতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং দৃঢ় ভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, যেরূপেই হউক, তাঁহাদের জীবনপদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইব এবং সমস্ত জগৎ যাহাতে সেই পদ্ধতির অনুগামী হইয়া ধন্য হইতে পারে তজ্জন্য প্রাণ পণে যত্ন করিব। এই ভাবিতে ভাবিতেই সেই সুখকল্পনার বিরাম হইয়া গেল, কিন্তু আমার সেই পতিজ্ঞার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু তখন বুঝিতে পাইলাম, আমি

কি দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে প্রাংশুজন ও অক্ষম, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বামন হইয়া আমি কোন্ সাহসে তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি? কিন্তু কি করিব? কল্পনামূলক হইলেও ঐ প্রতিজ্ঞা আমার হৃদয়কে এমনি অধিকৃত করিয়াছে যে, কি বিষয়ের গুরুত্ব দর্শনে, কি স্বকীয় দৌর্ব্বল্য স্মরণে, কিছুতেই আর তাহার প্রভাব হ্রসিত হইতেছেনা। গৃহদাহের ভয়ঙ্কর সময়ে ক্ষীণকায় রুগ্ন ব্যক্তি ও যেমন সবলজনোচিত কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়, আমিও তদ্রূপ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছি। অধুনা আর্য্য সমাজ রূপ বিশাল গৃহের শিরোদেশে বিপ্লবের বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, বহু সহস্রাব্দীসঞ্চিত অমূল্য রত্ন-রাজি ভস্মাবশেষে পরিণতি পাইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় জ্ঞানবলসম্পন্ন কৃতী ভ্রাতৃগণ উদাসীন রহিবেন বলিয়া কি দুর্ব্বল পঙ্গু প্রজ্বলিত হুতাসনে যথা সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিবে? অন্ততঃ কি সে একবার পৈতৃক ধন-সংরক্ষণে যত্নও করিবেনা? সে কি আর্য্য জাতি রূপিণী মহানদীর একবিন্দু জল ও নয় যে আপনার অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইবে? জগতে কি এমন জীব নাই একবিন্দু জলই যাহাদিগের সমগ্র জীবনের তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হয়? তাহার সত্ত্বা বরং তাহাদিগেরই জন্য। সে না হয় সুধু তাহা-

দিগেরই সমক্ষে পরম পবিত্র আর্য্যজীবনের প্রতিকৃতি ধারণে সচেষ্ট হইবে। এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই সে সেই জগদ্‌গুরু আর্য্য মহাত্মাদিগের পবিত্র জীবন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে। তাঁহারা কৃপা করিয়া এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন্, সে যেন তাঁহাদের দেব-জীবনের যথাযথ চিত্রাঙ্কনে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও সমর্থ হয়।

আর্য্য জীবন পর্য্যালোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যের লক্ষণ ও তাঁহার আদিম বাসস্থান প্রভৃতির নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। এজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনুসংহিতায় আর্য্যের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—প্রকৃত আচার ব্যবহারের বশবর্ত্তী থাকিয়া যিনি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান এবং অকর্ত্তব্যের পরিহার করেন, তিনিই আর্য্য (১)। মনুসংহিতায় "প্রকৃতাচার" এবং "সদাচার" শব্দদ্বয় একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শব্দার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও এইরূপ প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই বোধ হয়। "সদাচার" কাহাকে বলে তাহা নির্দ্ধারণ স্থলে মনু বলিয়াছেন— "সেই দেশে (ব্রহ্মাবর্ত্তে) পারম্পর্য্য-ক্রমাগত (যাহা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে) যে আচার ব্যবহার, সান্তরাল

(১) কর্ত্তব্য মনাচরন্ কাম মকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

(ব্যবধান বিশিষ্ট) বর্ণ নিচয়ের পক্ষে তাহাই সদাচার (১),,। এস্থলে ব্যবধান বিশিষ্ট বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যে বর্ণগত ব্যবধান রহিয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। বামন পুরাণের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সুকেশী নামক রাক্ষস শ্রেষ্ঠের নিকট পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সদাচারের লক্ষণ ও ফলশ্রুতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত মনূক্ত সদাচারের মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, বরং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্যই বর্ত্তমান। অন্যান্য সংহিতাকারগণও যে, সদাচারের লক্ষণ সম্বন্ধে মনু হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী নহেন তাহা নির্দ্ধারণ করাও বোধ হয় আয়াস সাধ্য নহে। অতএব মনূক্ত সদাচারকেই আর্য্য জাতির প্রকৃতাচার বলাতে আপত্তির কারণ দৃষ্ট হয় না। এখন দেখা আবশ্যক সেই সদাচারের লক্ষণ কোন্ সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ স্থান নিবাসীরা তাহার বশবর্ত্তী ছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে বংশানুক্রমে যে আচার প্রচলিত, তাহাই যখন সদাচার শব্দে উক্ত হইয়াছে (২) তখন ইহা সুতরাংই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ঐ

(১) তস্মিন্ দেশে (ব্রহ্মাবর্ত্তে) য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

(২) ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহারই যে কেন সদাচার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে "ব্রহ্মাবর্ত্ত,, শব্দ সমালোচন স্থলে তাহা বিবেচিত হইবে।

প্রদেশে আর্য্যগণের অধিবাস হইবার পর হইতে কতিপয় পুরুষ (জেনারেসান) পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্যবহার স্থূলতঃ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছিল, উত্তর-কালে তৎসমস্তই সদাচার শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব যখন দৃষ্ট হইতেছে যে, সদাচার নিচয় আর্য্যগণের ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিবার বহু পরে তন্নামে অভিহিত হইয়াছে এবং সেই সদাচারের বশবর্ত্তী জনগণই আর্য্য নামে কথিত হইয়াছেন, তখন এরূপ বলা অযৌক্তিক নহে যে, আর্য্যগণের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বে ঐ নাম (আর্য্য নাম) ছিল না; প্রত্যুত উক্ত প্রদেশে আসিবারও বহু পরে তাঁহারা আর্য্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

অপর ভগবান্ মনু ভারতীয় বেদনিরত ব্রাহ্মণ। বেদ হইতেই সমস্ত সদাচার অনুসৃত হইয়াছে। পশ্চাৎ উপপন্ন হইবে, সেই বেদের স্ফুরণ বা আবির্ভাব ব্রহ্মাবর্ত্তে হইয়াছিল। অতএব আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণের ব্রহ্মাবর্ত্তে অবস্থিতির পরে সদাচারের জন্ম। যখন সেই সদাচারের বশবর্ত্তিগণই আর্য্য, তখন এইরূপ নির্দ্ধারণই যুক্তিসঙ্গত যে, ব্রহ্মাবর্ত্তে অবস্থিতির পর হইতেই আর্য্য উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছিল।

অতঃপর আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধান করা যাইতেছে। আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া অনেক মত ভেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলারের অনুবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনুমান করেন গ্রীক্, ল্যাটীন প্রভৃতি ইউ-

রোপীয় বহু ভাষায় বিদ্যমান কর্ষণার্থক অর্ ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ভারতীয় আর্য্যগণের এবং ইদানীন্তন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতি নিচয়ের আদিপুরুষগণ যখন মধ্যএসিয়ার স্থান বিশেষে(১) একত্র (এক পরিবাররূপে) ছিলেন তখন হইতেই কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয়, সুতরাং বিভিন্ন বংশরূপে বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিবার পরেও তাঁহাদের মধ্যে একত্রাবস্থানকাল-ব্যবহৃত অন্যান্য বহু শব্দের ন্যায় কৃষিবোধক অর্ শব্দটী প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপি পৃথক্ পৃথক্ জাতির ভাষা কালক্রমে পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি ধারণ করা সত্ত্বেও ঐ শব্দটী ঐ সমস্ত জাতির ভাষায় কর্ষণবোধক ধাতুরূপে অবস্থিতি করিতেছে। এই যুক্তি তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে ভারতীয় আর্য্যগণের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায়ও কর্ষণার্থক অর্ ধাতু বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু কর্ষণার্থক দূরে থাকুক্ অর্ ধাতুই আদৌ সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান নাই। তবে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারাই প্রথমে জীবনধারণ আরম্ভ করেন, এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যশব্দ কর্ষণার্থক অর্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড় যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃতে বৈশ্য বোধক যে অর্য্য শব্দ বিদ্যমান আছে,

(১) পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

তাহার উত্তর প্রত্যয় বিশেষ দ্বারা আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বৈশ্যগণ কৃষিব্যবসায়ী সুতরাং এইরূপ নিষ্পাদনেও আর্য্য শব্দ কৃষিব্যবসায়ী অর্থেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ অনুমান ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। কেননা অর্য্য শব্দে যদি বৈশ্য না বুঝাইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই কৃষ্যুপজীবী বুঝাইত, তাহা হইলেও না হয় বুঝিতাম, আর্য্যগণ সকলেই যখন প্রথমে কৃষি ব্যবসায়ী ছিলেন তখন অর্য্য বলিতে তাঁহাদের সকলকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু অর্য্য শব্দ তাহা না বুঝাইয়া মাত্র বৈশ্য বুঝাইতেছে। বৈশ্যের কর্ত্তব্য একমাত্র কৃষিকার্য্য নয়, উহা বহু-কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম (১)। সুতরাং অর্য্যশব্দ কৃষি ব্যবসায়ীরূপ সমগ্র আদিম আর্য্যজাতিবোধক না হইয়া আর্য্যজাতি নিচয়ের অন্যতম একমাত্র বৈশ্য-বোধকই হইতেছে। অতএব যুক্তিতঃ অর্য্য শব্দ হইতেও আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইতেছে না।

সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানার্থক ঋ ধাতু আছে। উহার উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। এস্থলে নিপাতন বলিয়া যদি আপত্তি

---

(১) পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
মনু ১।৯০

ক) কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
ভগবদ্গীতা, ১৮শ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।

করা যায়, সে আপত্তি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, কেননা বহু প্রয়োজনীয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ব্যাকরণে যাঁহার সামান্য রূপ জ্ঞান আছে তিনিও নিপাতন নিষ্পন্ন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দের নামোল্লেখ করিতে পারিবেন। এরূপ অনুমানের মূলে প্রকৃষ্ট হেতুও বিদ্যমান আছে। ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, আর্য্যগণই প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে জগতের শিক্ষাগুরু। তাঁহারা জ্ঞানের উৎসবিশেষ ছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়কন্দর হইতে যে সমস্ত জ্ঞান-রাশি উৎসারিত হইয়াছিল জগৎ আগ্রহের সহিত তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় ইদানীন্তন সুসভ্য দেশ নিচয়ের কথা দূরে থাকুক্, মিসর এবং গ্রীসাদি প্রাচীনতম সভ্য দেশ সমস্তও বিদ্যা, এবং জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের বয়ঃ কনিষ্ঠা ভগিনী। অতএব আর্য্যগণই যখন জগতের জ্ঞানদাতা তখন জ্ঞানার্থক ঋ ধাতু হইতে আর্য্য শব্দের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে।

অধুনাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক দিগের মধ্যে অনেকে আর্য্য উপাধি সুধু ভারতীয় আর্য্যগণ সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মান্ প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য জাতিনিচয়কেও প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত জাতি সমস্তের এবং ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ একই বিশাল জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহাই তাঁহাদের ঐ রূপ একই উপাধি প্রদানের নিদান। কিন্তু উপরে

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ রূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, আর্য্য উপাধি ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ভারতে প্রবেশের বহু পরে সৃষ্ট এবং গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহাঁদের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশে গমন করিয়াছেন, ঐ উপাধি তৎসমস্ত জাতীয় দিগকে প্রদান করা যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। অতএব আমরা আর্য্য উপাধি সুধু ভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ হিন্দু অর্থেই ব্যবহার করিব।

অনন্তর হিন্দু শব্দের মূল নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক

আর্য্য শব্দের ন্যায় হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। মেরুতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশে "হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে,, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ অনুমিত হয় যে, যাহারা হীন অর্থাৎ অসদাচার-ব্যবহার-পরায়ণ জাতীয় দিগকে দূষণীয় বা অপাংক্তেয় মনেকরেন তাঁহারাই হিন্দু। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তজ স্বীয় সুবিখ্যাত ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে মেরু তন্ত্রোক্ত ঐ শ্লোকের শেষাংশে বর্ণিত ইংরেজ, লণ্ড্র (লণ্ডন,) ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে ঐ তন্ত্র যে নিতান্ত আধুনিক তাহাই অবধারিত করিয়াছেন, এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিতের ন্যায় " হিন্দু ,, শব্দকে "সিন্ধু,, শব্দজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্ধারণের বিশিষ্ট হেতুও আছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ একটী প্রকাণ্ড আদিম জাতি হইতে বহির্গত শাখা বিশেষ। ঐ মূল জাতির আদিম স্থান আসিয়া খণ্ডের মধ্যভাগসংস্থিত "বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমাবস্থ ও আমু নদীর প্রস্রবণ-সন্নিহিত হিমাবৃত উন্নত-ভূমি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।,, মানব মণ্ডলীর সূতিগৃহ স্বরূপ ঐ হিমাবৃত প্রদেশ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভারতের পশ্চিমোত্তরে প্রবহমান সিন্ধু নদের পঞ্চ- শাখা-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশে সমুপস্থিত হন। প্রথমাবস্থিতি-স্থান সিন্ধুপ্রদেশ নিবন্ধন সিন্ধু নাম হইতেই "হিন্দু,, নাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কেননা অধ্যুষিত স্থানের নামে অধিবাসিদিগের নাম-সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তবে যে "সিন্ধু,, ও "হিন্দু,, শব্দদ্বয়ে আকৃতিগত পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা ভাষা-স্তরিত হইবার অনিবার্য্য পরিণাম। আবস্তা নামক পুরা-তন পারসিক ভাষায় যেরূপ স্থলে "হেন্দু,, শব্দ ব্যব-হৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় অবিকল তদ্রূপ স্থলে সিন্ধু শব্দ প্রযুক্তআছে। "হপ্ত হেন্দু,, ও "সপ্ত সিন্ধু,, একেবারে একই শব্দ। ঐ দুই ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য বহু শব্দও ঠিক্ একই নিয়মানুযায়ী পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছে। এতদ্দারা পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করিয়াছন যে, "হিন্দু,, শব্দ সংস্কৃত "সিন্ধু,, শব্দেরই অপভ্রংস এবং ঐ নাম পারসিক দেশবাসিদিগেরই

প্রদত্ত।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে পঞ্জাবে সমুপস্থিত হন। কাল ক্রমে বংশবৃদ্ধি সহকারে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি নামক প্রদেশদ্বয় এবং তদনন্তর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহাদের আবাসভূমি হইয়া উঠে। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি এবং আর্য্যাবর্ত্ত তিনটী নামই তাঁহাদের তত্তৎস্থানে অধিবাসের পর প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর, বেদ এবং তত্ত্ব, এবং আবর্ত্তশব্দের অর্থ চিন্তা। এই স্থানেই সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরচিন্তা এবং বেদ ও তত্ত্ব বিদ্যার অনুধ্যান আর্য্যহৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবর্ত্ত অর্থ উচ্চারণ বলিয়া, ঐ স্থানে সর্ব্ব প্রথমে বেদধ্বনি সমুচ্চারিত হইয়াছিল জন্য ঐ স্থানের ঐ রূপ নামকরণ হইয়াছে অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ ঐ শব্দটী ব্রাহ্মণার্থক ব্রহ্মন্ এবং বাসস্থান বোধক আবর্ত্ত শব্দযোগে সমুৎপন্ন বিবেচনা করেন। ইঁহারা বলেন এইস্থানে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথমে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। এই অনুমান তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বোধ হয়না, কেনন! যদিও ব্রাহ্মণ জাতিই সর্ব্ব প্রথমে বেদ ও ঈশ্বর জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তাঁহারাই যে কোন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর বর্ণবিভাগ হইবার পুর্ব্বে ঐ স্থান অধ্যুষিত হইয়া থাকিলে "ব্রাহ্মণেরাই বাস করেন,, কথা

অসংলগ্ন হইয়া উঠে, কেননা তখন ব্রাহ্মণাদি নামকরণই হয় নাই। যাহাহউক বেদ ও ঈশ্বর জ্ঞান সর্ব্ব প্রথমে এই স্থানে অভ্যুদিত হওয়াতেই যে এই স্থানের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ দৃষ্ট হয় না। যে স্থানে বেদ ও ঈশ্বরজ্ঞান সর্ব্ব প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই স্থান আর্য্যজাতির অতি আদরের স্থান। বিশেষতঃ যে সকল মহর্ষিগণ সেই বেদ ও ঈশ্বর জ্ঞানে বিভুষিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে জগদ্‌গুরুর পবিত্র আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন, সেই সকল মহাত্মগণ যে আর্য্যজাতির অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত আচার ব্যবহারাদি ও আর্য্যজাতির সর্ব্বথা অনুকরণীয়। বোধ হয় এই জন্যই "ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে পারম্পর্য্য-ক্রমাগত আচারই যথার্থ সদাচার,, এইরূপ উক্ত হইয়াছে শাস্ত্রে এই পবিত্র ভূভাগ পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (১)। সরস্বতী এখন অন্তর্হিত এবং দৃশদ্বতী কাগার নামে খ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত অধুনাতন দিল্লীর ন্যূনাধিক একশত মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। অনন্তর "ব্রহ্মর্ষি,, প্রদেশ। এই স্থানে ঋষিগণ ঈশ্বর, বেদ কিংবা

১। সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
মনু ২। ১৭

পরমার্থতত্ত্ব চিন্তনে নিরত থাকিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহা ঐ রূপ গৌরবার্হ এবং শ্রদ্ধাকর্ষি নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকিবে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) এবং শূরসেন (মথুরা) এই চারি প্রদেশাত্মক বিস্তীর্ণ ভূভাগ "ব্রহ্মর্ষি,, নামে অভিহিত ছিল (১)। অধুনা পূত-সলিলা জাহ্নবী এবং "সুন্দর তট শালিনী,, যমুনা যে সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারিত করিতেছে, উত্তর বিহার সমেত সমগ্র সেই ভাগই প্রাগুক্ত প্রদেশ-চতুষ্টয়সমন্বিত "ব্রহ্মর্ষি,, দেশ। "ব্রহ্মর্ষি দেশ,, অধ্যু-ষিত হইলেও যখন আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের বর্দ্ধিষ্ণু বংশ পরম্পরার স্থান-সঙ্কুলন হইয়া উঠিলনা, তখন পূর্ব্বদিকে সুবিশাল বঙ্গসাগরের ফেণিল উপকূল, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র প্রায়োদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌতকারী আরব্য সমুদ্রের অনতিপ্রসর শাখাদ্বয়, উত্তরে হিমমণ্ডিত স্ফটিকশুভ্র পর্ব্বতরাজ হিমালয় এবং দক্ষিণে নানাবিধ ওষধিসমন্বিত সুবিশাল বিন্ধ্যাচল, এই চতুঃসীমাবেষ্টিত বহ্বায়ত ভূভাগ ব্যাপিয়া আপনাদের অধিবাস স্থান নির্দ্ধারিত এবং আপনাদের নামের অনুসারী করিয়া এই ভূভাগকে "আর্য্যাবর্ত্ত,, অর্থাৎ আর্য্য

১। কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥
মনু ২। ১৯

গণের বাসস্থান নামে আখ্যাত করিলেন (১)। অভিধান-কার ধীমান অমর সিংহ ও আর্য্যাবর্ত্তকে বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বকীয় সুবিখ্যাত কোষগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (২)।

কালক্রমে যখন আর্য্যাবর্ত্তেও স্থানসঙ্কুলন হইলনা, তখন নিয়ম করা হইল, যে যে ভূখণ্ডে কৃষ্ণসার নামক মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই সেই স্থান যজ্ঞের উপযুক্ত বিধায় আর্য্যগণের বাসের যোগ্য, তদেতর স্থান ম্লেচ্ছদেশ সুতরাং তাঁহাদের বাসের অযোগ্য (৩)। কৃষ্ণসার মৃগের মেধ তাঁহাদের যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত কি না বলা যায় না, কিন্তু উহার অজিন (চর্ম্ম) যে পবিত্র জ্ঞানে উপনয়ন কালে আচার্য্য, মাণবক অর্থাৎ উপনীত বালককে পরিধান করাইয়া দিতেন, সামবেদি উপনয়ন মন্ত্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় (৪)। স্থলান্তরে কৃষ্ণসারচর্ম্মের

১। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বা দাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
মনু। ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

২। আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।
অমরকোষ।

(৩) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশ স্ততঃ পরঃ॥
মনু ২।২৩।

(৪) ততো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং আচার্য্যো মাণবকং পরিধাপয়েৎ। সর্ব্ব সৎকর্ম্মপদ্ধতি।

উত্তরীয় পরিধানের বিধান দৃষ্ট হয় (১)। বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই, কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশ আর্য্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর যখন দৃষ্ট হইল, স্থানসম্বন্ধে যতই কেন নিয়ম নির্দ্দেশ না করুন্, কোন নিয়মই চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না, তখন এমন কোন বিধান করা আবশ্যক হইল যে, তাহাতে কোন কালেও স্থানের সঙ্কীর্ণতাজনিত অসুবিধা সহ্য করিতে না হয়। তখন বিধান করা হইল, শাস্ত্রোচিত সংক্রিয়া-সম্পন্ন হইয়া আর্য্যগণ যথেচ্ছস্থানে বাস করিতে পারিবেন। এইরূপে উত্তর কালে আর্য্যগণের বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম রহিল না। অতঃপর যদিও স্থলবিশেষে স্থানের দোস গুণ বিবেচনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, আর্য্যগণ যতই কেন দূরদেশব্যাপ্ত হইয়া না পড়ুন্, আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থান কালেই যে তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইয়া ছিল এবং সেই দেশ যে তজ্জন্যই পুণ্যভুমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আর্য্যাবর্ত্ত অতিরমণীয় স্থান প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে কিছু মনোরম সামগ্রী ছিল, বিধাতা স্বহস্তে বাছিয়া লইয়া তাহা ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার কোথাও গগণস্পর্শী তুষার-মণ্ডিত

(১) কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।

মনু ২'৪১।

শৈলরাজি, কোথাও কলনাদিনী সুদূরগামিনী স্রোতস্বতী, কোথাও নানাবৃক্ষ-পরিশোভিত সুরম্য অরণ্যানী, আবার কোথাও শ্যামল-দূর্ব্বা-দল-পরিশোভিত সুবিস্তীর্ণ সমতল-ভূমি, এইরূপ স্বভাব বৈচিত্র্যে আর্য্যাবর্ত্ত পৃথিবীর নন্দন কানন। আবার সুধু দৃশ্যশোভায় ই ইহার ভাব-বৈচিত্র পর্য্যবসিত হয় নাই। নদী-মাতৃকতা নিবন্ধন ইহা শস্য-সম্পত্তিতেও অদ্বিতীয়। যাঁহারা মিসরকে পৃথিবীর শস্য ভাণ্ডার আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি ভারতের, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের, শস্য-শালিতার বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে মিসরকে ঐ গৌরবাহ উপাধি হইতে বঞ্চিত করিয়া একমাত্র আর্য্যাবর্ত্তকেই উহা প্রদান না করুন্, আর্য্যাবর্ত্তকে যে উহার অংশভাগী করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈদৃশ উর্ব্বর ভূখণ্ডে সংস্থিত হইয়া আর্য্যগণ অল্পায়াসেই প্রচুর ফল শস্য সঞ্চয়ে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আহার্য্য চিন্তা তাঁহাদিগকে অল্পই বিব্রত করিতে সমর্থ হইল। মনুষ্য মনের প্রকৃতিই এই যে, উহা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, এক বিষয় না এক বিষয় চিন্তা করিবেই করিবে। এমন কি সুষুপ্তি সময়ে পর্য্যন্ত উহার কার্য্য স্থগিত হয় না। তবে কিনা নিদ্রার গাঢ়তা নিবন্ধন তৎকালে চিন্তিত বিষয় নিচয়ের ভাব, হৃদয়ে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কনে সমর্থ হয় না। এই চিন্তাপ্রবণ মানব-মনের যাবতীয় চিন্তা-মধ্যে আহার সম্বন্ধীয় চিন্তা সর্ব্বপ্রধান। উহা যেমন মনুষ্যকে অভি-

ভূত করিতে সমর্থ, বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ক চিন্তাই ততদূর নহে। (১) সুতরাং যে যে পরিমাণে, সেই চিন্তায় অভিভূত হইবে, সে সেই পরিমাণে বিষয়ান্তরচিন্তনে অল্প অবসর পাইবে, এবং যে যে পরিমাণে সেই চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিবে, সে সেই পরিমাণে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের অবকাশ পাইবে। এমত স্থলে আহার্য্য চিন্তায় অনভিভূত আর্য্যগণ যে বিষয়ান্তরে মনকে সমধিক প্রধাবিত করিবেন ইহা স্বভাবতঃই উপলব্ধি হয়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের একশেষ প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং

(১) কথিত আছে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে কোন পণ্ডিতই কোন কালে কবিত্বে পরাজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট সকলে একবাক্যে এই প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ভদ্রে! আপনার স্বামী অদ্য রাজ সভায় গমন করিবার পূর্ব্বে আপনি যদি আমাদের হিতের জন্য অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলেন যে, অদ্য গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, তাহাহইলে আমরা একান্ত বাধিত হই।" পণ্ডিত মণ্ডলীর এইরূপ করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তিনি তদ্রূপই করিতে সম্মত হইলেন, এবং যথাসময়ে প্রার্থনানুরূপ কার্য্যও করিলেন। কালিদাস নিয়মিত সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সে দিন আর পূর্ব্বের ন্যায় চমৎকারিণী প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে এই অচিন্তিত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কালিদাস বলিলেন, "অন্ন চিন্তা চমৎকারে কাতরে কবিতা কুতঃ? অর্থাৎ অন্ন চিন্তায় অভিভূত ব্যক্তিতে কবিতার স্ফূরণ কোথা হইতে হইবে?"

আর্য্য-চক্ষু এবং আর্য্য-হৃদয় তাহারই প্রতি সতৃষ্ণ ভাবে ধাবিত হইল। সেই সুদূর প্রাচীনকাল জাতীয় জীবনের বাল্য লীলার সময়। তখন সরলতাই মনের স্বাভাবিক ভূষণ ছিল, কুটিলতার অন্তঃস্পর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টি তখনও হৃদয়ে স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই। সরল-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-প্রবণ। উহা ধর্ম্মের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বে অধিরোহণ করিতে অক্ষম হইলেও, ইতস্ততঃপ্রসারিত দৃশ্যনিচয়ের বহিরাবরণেই ধর্ম্মের মূর্ত্তি বিলিখিত দর্শনকরে (১)। এই রূপে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মভাব নিরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত ও অলক্ষিতরূপে জীবনের কর্ত্তব্যাবলীর সহিত ধর্ম্ম ভাব সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অধিকাংশ কার্য্য সম্পাদনের সময়ই উহা ধর্ম্ম্য কি তদ্বিগর্হিত তাহা বিবেচিত এবং তদনুসারে উহা অনুসৃত বা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। আর্য্য জীবনের কর্ত্তব্যাবলীতে ধর্ম্মের আধিপত্য এমনি পরিলক্ষিত হয় যে, ধর্ম্মের পবিত্র নাম স্মরণ ব্যতীত তাঁহাদের একটী কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। যে কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, অমনি তাহা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কর্ত্তব্য শ্রেণীতে নিবিষ্ট এবং যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইত, তাহাও সেই ধর্ম্মেরই দোহাই দিয়া অকর্ত্তব্য শ্রেণীর অন্ত র্নিবিষ্ট করা হইত। এইরূপে আর্য্য জীবনে ধর্ম্ম ও কার্য্য এমনই সম্বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্ম হইতে কার্য্যকে বা

(১) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

কার্য্য হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। আবার এই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়, এই জন্য নানাবিধ পুরস্কার তিরস্কার এবং স্বর্গ নরক প্রকল্পিত হইয়াছে। এইরূপ কল্পনা যে স্বাভাবিক, পৃথিবীর সমস্ত দেশের বাল্যেতিহাসই তাহা সপ্রমাণ করে। তবে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই যে ধর্ম্মের এই রূপ আধিপত্য, তাহা ভারতে যেমন অধিক পরিমাণ দৃষ্ট হয়, অন্য কোন দেশে তদ্রূপ নহে। ভারতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের এবং ভূমির উর্ব্বরতার আধিক্যই যে এইরূপ অধিকতর ধর্ম্মভাবপ্রবণতার নিদান, তাহা পূর্ব্বেই উপপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় আর্য্যগণ ইহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের স্বাভাবিক সম্পত্তি, বিশেষতঃ সমস্ত জগৎ যখন এক বাক্যে ধর্ম্মকেই জীবনের একমাত্র না হউক, প্রধানতম লক্ষ্য মনে করে, তখন, যে শাসনের ভিত্তি সেই ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত হইবে, সেই শাসন অবশ্য অধিকতর ফলোপধায়ক হইবে এবং তাহার স্থায়িত্ব ও জীবনান্ত পর্য্যন্ত রহিবে। ফলতঃ, এইরূপ কোন সাধুভাব দ্বারা পরিচালিত না হইলে কখনই জনহিতৈষী শাস্ত্রকারগণ এত যত্ন করিয়া ধর্ম্ম ও কার্য্যের গাঢ়মিশ্রণের প্রয়াসী হইতেন না। যাহাহউক, তাঁহাদের অবলম্বিত কার্য্য ও ধর্ম্মভাব মিশ্রণের পদ্ধতি দ্বিবিধ। যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম বিধান তাহার উৎসাহ দাতা, আর

যাহা অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম-বিধান তাহার নিবারয়িতা। প্রথমটী প্রবর্ত্তক-বিধির অন্তর্ভূত এবং দ্বিতীয়টী নিবর্ত্তক বিধির বিষয়ীভূত। প্রবর্ত্তক-বিধি স্থলে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট আহার্য্য পানীয়াদি প্রাপ্তিরূপ ঐহিক সুখ এবং অনন্ত সুখ-ধাম বৈকুণ্ঠে বাসাদিরূপ পারলৌকিক সুখ প্রভৃতি অশেষবিধ ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নিবর্ত্তক বিধিস্থলে কার্য্যের দূষ্যতা ও অকরণীয়তা বদ্ধমূল করিবার জন্য তদ্রূপ পুত্র-নাশ বিত্তক্ষয়াদি রূপ ঐহিক দুঃখ এবং ঘোর-দুঃখ-সমাকুল নরক বাসাদি রূপ পারলৌকিক অশেষ বিধ দোষশ্রুতি প্রকটিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মনীষিদিগকে ঐ সমস্ত কল্পনার আবরণ ভেদ করিয়া মূলে অবতরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে কোন্ রূপ কল্পনায় বাস্তবিক উদ্দেশ্য যে কি ছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

লেখকের লেখনী সাধারণতঃ লিখিতব্য বিষয়কে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া থাকে। মানব মন স্বভাবতঃই কিছু অতিরঞ্জন-প্রিয়। উহা প্রকৃত সত্যের গাত্রেও কিছু বর্ণনার লাবণ্য দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে সেইরূপ বর্ণনচ্ছটা একেবারেই নাই, সেখানে যে সত্য নিহিত থাকে, তাহা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। বাস্তবিকই জগৎ কিছু তমপ্রত্যয়ের পক্ষপাতী। ব্যাকরণে, দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ স্থলে "তর,, ও বহুর মধ্যে একের

উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ স্থলে "তম,, প্রত্যয় হইয়া থাকে। যে বাক্যে তর প্রত্যয়ান্ত শব্দ থাকে, লোকে তাহা যত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে, 'তম, প্রত্যয়ান্ত বাক্য সকল তদপেক্ষা বহুগুণ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকে। ইংরেজীতে যাহাকে "সুপার্‌লেটিব্,, বলে, আমরা অন্য কোন উপযুক্ত নাম না পাইয়া তাহাকেই 'তম প্রত্যয়ান্ত, শব্দে বর্ণনা করিলাম। এই সুপার্‌লেটিব্ প্রিয়তা কি 'গ্রন্থে, কি সামান্য পত্রিকাতে, কি বাক্যালাপে, কি বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান জনগণ সর্ব্বত্রই ঐরূপ অতিরঞ্জনের ভিতর হইতে প্রকৃত সত্য বাছিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সুপার্‌লেটিব্ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহৃত দেখিয়াও বিরক্ত হই না, তাহাই যদি প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তবেই আমরা শাস্ত্রগুলির চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে বসি। তখন যেন আমরা একেবারে সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া সকল কথা মাপিয়া লইতে বসি। সত্য বটে, যে শাস্ত্র দ্বারা সমাজ শাসিত হইবে, যাহার আশ্রয়ে সমাজতরু প্রতিপালিত হইবে, তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন-প্রিয়তা স্থান লাভ করিলে তদ্দ্বারা যত অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, অন্য কোন পুস্তকে বা পত্রিকাতে ঐরূপ থাকিলে তত অনিষ্টের কারণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত যে, মনুষ্য মনের তৃষ্ণাই অতিরঞ্জনের দিকে? যদি শাস্ত্রকারগণ একেবারে

অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ না করিতেন, তবে কয়জন লোকে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ বা গ্রহণ করিত? এই জন্য শাস্ত্রাদিতে সুপার্‌লেটিবের বাহুল্য দেখিলেও একেবারে রাগান্ধ হইয়া তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ না করিয়া যুক্তির আশ্রয়ে তাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত যাত্নিক হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক যুক্তিই প্রকৃত তত্ত্বান্বেষণে প্রধানতম সহায়। শাস্ত্ররূপ সুগন্ধি কুসুম নিচয় হইতে তত্ত্বরূপ মধু সংগ্রহে যুক্তিই সুনিপুণ ভ্রমর। এই জন্যই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি যুক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন স্থলে কহিয়াছেন, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম নাশ হয় (১)।

অনেকে হিন্দু শাস্ত্রের দোষ কীর্ত্তন স্থলে বলিয়া থাকেন —শাস্ত্রোক্ত ফলাফল কখনই প্রত্যক্ষ হয় না; যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার শাসন মানিয়া চলিবার কোন হেতু নাই, সুতরাং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে আমরা বলিতে চাই, অনেক স্থলে শাস্ত্রোক্ত ফলাফল প্রত্যক্ষ হয়না, ইহা ঠিক্ কথা। কিন্তু তত্তৎস্থলে আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে কার্য্যের ফল দৃষ্ট হয় না বলিয়া আমরা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি, সেই কার্য্য বাস্তবিক শাস্ত্রোক্ত বিধি মতে সুসম্পন্ন হইয়াছে কি না? যদি তাহা না

(১) কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্ম নাশঃ প্রজায়তে॥

হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিবার কারণই তো তাহাতে নাই, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ফল প্রত্যক্ষ হইল না বলিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিতে আমরা ন্যায়তঃ অধিকারী নহি। অপর, যাহার ফল আশুপ্রত্যক্ষ না হয়, তাহাই যে একেবারে অফলপ্রসূ, তাহার ফল যে কখনও ফলিবেনা, তাহা আমরা কেমনে বলিতে পারি? আমরা কি দিন দিন এমন বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিনা, যাহার ফল আশুপ্রত্যক্ষ হওয়া দূরে থাকুক্ বহু বৎসর এমন কি পুরুষাধিক পরেও ফলিতে পারে? তবে শাস্ত্রোক্ত ফলাফল আশুপ্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আমাদের কি অধিকার আছে? অবশ্য তাই বলিয়া আমরা "শাস্ত্রের প্রত্যেক বর্ণই অভ্রান্ত,, এরূপ বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিতেছিনা। এখানেও আমরা যুক্তিপথাবলম্বী হইয়াই সত্যনিষ্কাশন করিতে বলিতেছি। অধুনা শাস্ত্রোক্ত ফলাফল সম্বন্ধে যেরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও যে তাহা না হইত এমন নহে। এই নিমিত্ত তত্তৎস্থলে শাস্ত্রকার গণ সাধারণের বোধ সৌকার্য্যের জন্য এই উদাহরণটী ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পীড়া কালে শিশুপুত্র নিম্বাদি তিক্ত রস সেবনে যেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে জ্ঞানবান পিতা তাহাকে মিষ্ট লড্ডুকাদির প্রলোভন দেখাইয়া উহা পান করাইয়া থাকেন, অথচ তৎসমস্ত প্রদান করেন

না, (১) তদ্রূপ পরম জ্ঞানী শাস্ত্রকারগণ অজ্ঞতারূপ ঘোর পীড়াগ্রস্ত জনগণকে নানাবিধ ফলশ্রুতির প্রলোভন দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকেন। বালক যেমন লড্ডুকাদি আশুতৃপ্তিজনক অথচ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু না পাইলেও পরম সুখপ্রদ স্বাস্থ্যরত্ন লাভ করে, সদনুষ্ঠান-কারী ব্যক্তিও তেমনি শাস্ত্রোক্ত হিরণ্য গবাদি প্রাপ্ত না হইলেও সুদুর্লভতর আত্মপ্রসাদ এবং ধর্ম্মরত্ন লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে আমরা এইরূপ ভাবেরই পক্ষপাতী। অনেকে হিন্দুশাস্ত্রে রূপক-বাহুল্য দেখিয়া উহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে শাস্ত্রবিধি জীবনে পরিণত করিতে হইবে, যাহার নিষেধ ও বিধিমতে না চলিলে পাপ স্পর্শিবে, তাহা সহজ ভাষায় সাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য। কেননা তাহা না হইলে সকলে তাহা কেমনে বুঝিবে? এই আপত্তির নিরসনে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ঐরূপ রূপক কল্পনা অযৌক্তিক নহে; উহার মূলে যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ, ধর্ম্মা ধর্ম্ম পাপ পুণ্য সমস্তই মনোজগতের বিষয়। যাহা মনোজগতের বিষয়ীভূত, তাহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইলেই বাহিরের দৃষ্টান্তাদির অনুসরণ করিতে হয়। কেননা মনোজগতের উচ্চ তত্ত্ব মনো-

(১) পিবনিম্বং প্রদাস্যামি খলুতে খণ্ড লড্ডুকম্
পিত্রেব মুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেবত ॥

বিজ্ঞানের উচ্চভাষায় বিবৃত করিলে জনসাধারণ তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। অপর, পাপ পুণ্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়ের যে আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি সূক্ষ্মফল, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে বিশেষ কোন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই; কেননা ঐ সমস্ত বিষয় অল্পধী-জনের ধারণার অযোগ্য। কিন্তু যদি মনোজগতের কোন একটী তত্ত্বকে সাধারণের দৃশ্য কোন বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা কতক ধারণা করিতে পারে। অতএব সাধারণকে শাস্ত্রবিধির অনুগামী করিবার জন্য রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করিয়া, মনো জগতের তত্ত্বগুলিকে তাহাদের বোধযোগ্য করা অযৌক্তিক নহে। অপর, অনেক তত্ত্ব এমন আছে, যাহা সাধারণের নিকট একেবারে প্রচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। যদিও তৎসমস্ত তাহাদিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে মহোপকার সাধিত হইতে পারে, তথাপি অবস্থা বিশেষে তাহা তাহাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা মহানুভব মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের নামোল্লেখ করিতে পারি। উক্ত মহাত্মার জীবনের কার্য্যগুলিকে যদি বিশ্লেষ করিয়া দেখা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই তাহার মূল কথা "সোঽহং"। "সোঽহং" এই কথাটী শুনিতে কত সামান্য! কিন্তু, ইহার ভিতরে এত তত্ত্ব

নিহিত রহিয়াছে যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাশীকৃত গ্রন্থেও তাহা নাই। ঐ কথাটীর শব্দগত অর্থ কি? না, "আমিই সেই,, অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম। এই অর্থ শুনিয়া কোন্ অল্পধী ব্যক্তি হাস্ত-সংবরণ করিতে পারে? কে উহাকে ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত প্রলাপ বলিয়া অবজ্ঞা না করিতে পারে? কিন্তু, উহা একটী এমনি বিশুদ্ধ ও ধর্ম্ম বিজ্ঞান-মূলক মত যে, উহার সত্যতা অস্বীকার করা কাহারও পক্ষে অনায়াস সাধ্য নহে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ঐ মতটীকে এমনি যুক্তি-মূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা বিচার-ধারে খণ্ডন করা মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও দুঃসাধ্য। কিন্তু তাঁহার মত যত কেন বিশুদ্ধ না হউক, যত কেন অখণ্ডনীয় না হউক, অল্পধী ব্যক্তির কি ক্ষমতা আছে যে, সে ঐ গূঢ় তত্ত্বের এক বিন্দুও ধারণে সক্ষম হয়? তাহার কর্ণে ঐ মহামন্ত্র প্রদত্ত হইলে সে কি উহার মূল্য কিছুমাত্রও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে? কখনই নহে। সে আরও উহা লইয়া নানারূপ হাস্ত পরিহাস করিবে এবং সম্ভবপর হইলে স্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া মহাত্মা শঙ্করকে অবমানিত করিতে সচেষ্ট হইবে। এই জন্যই এইরূপ গূঢ় তত্ত্বগুলিকে অজ্ঞদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। বাস্তবিক পাত্রভেদে উপদেশ প্রদান করাই একান্ত যুক্তি সঙ্গত। নহিলে হিতে বিপরীতই ঘটিবার কথা। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—যোর

বিপদে পতিত হইয়া যদি ব্রহ্মবাদিকে বিদ্যার সহিত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও বরং করিবেন, তথাপি অপাত্রে বিদ্যার্পণ করিবেন না (১)। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেনঃ—এই যে গীতার্থ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা কদাচ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিহীন, ভক্তিশূন্য ও মৎপ্রতি অসূয়াপরবশ ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইও না (২)। বাস্তবিক, যে বালক শিশুশিক্ষা পাঠেও অসমর্থ, তাহাকে জ্যামিতির উচ্চ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র; উহা তাহার পক্ষে হিতকর হওয়া দূরে থাকুক, মহা অনিষ্টকরই হইয়া উঠে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ কৌশলক্রমে কতকগুলি বিষয়কে রূপকের কঠিন আবরণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন; যেন, যৎসামান্য লোকে উহা আয়ত্ত করিতে যাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত না হয়। এইরূপ আবরণ যদি না থাকিত, তবে দন্তোদ্‌গমের পূর্ব্বে বালকগণ কঠিন খাদ্য খাইতে যাইয়া যেমন বিড়ম্বিত হয়, জন সাধারণ তদপেক্ষাও অধিক বিড়ম্বিত হইত সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকার

---

(১) বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ॥

মনু ২। ১১৩।

(২) ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

গীতা ১৮। ৬৭।

গণ প্রধানতঃ এই নিমিত্তই অনেক গূঢ় বিষয়কে রূপকের আবরণের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছেন। আবার এই যে রূপক, ইহার ভিতরেও তাঁহারা সকল বিষয় স্পষ্টরূপে বিবৃত না করিয়া সময় সময় আভাসমাত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে গুরূপদেশ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে গুরুগম্যের এত প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই জন্যই গুরুগম্য ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (১)।

শাস্ত্রে রূপক বর্ণনার আরও একটী কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন কালে—ভাষার বাল্য ও কিসোর বয়সে যখন মানব মন কবিতারসপানে অধিকতর বিভোর থাকে, তখন হইতেই কবিতাস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে রূপকেরও স্ফুরণ হইতে আরম্ভ করে। পরে ভাষার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কবিতার পরিবর্ত্তে মানবমন বিজ্ঞানোচিত ভাষার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু, রূপকের স্ফুরণ তখনও নিবৃত্তি পায় না। উহা তখনও গ্রন্থ পৃষ্ঠে, আখ্যায়িকা বর্ণনে এমন কি কথোপকথনচ্ছলেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা একটী উপন্যাসের উল্লেখ করিতেছি।

(১) গুরু ভক্তির বিষয় বর্ণনস্থলে সবিস্তার বর্ণিত হইবে।

একদা পারস্য দেশীয় কোন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত তত্রত্য সম্রাটের নিকট আখ্যায়িকাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, ভারত-বর্ষে এরূপ একটী বৃক্ষ আছে, যাহার ফল ভক্ষণ করিলে মনুষ্য অজর অমর হইতে পারেন। সম্রাট ইহা শুনিয়া সেই ফল আনয়নের জন্য একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে ভারতে পাঠাইলেন। ভৃত্য বহুদিনব্যাপী ক্লেশকর অনুসন্ধানেও আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে সমর্থ হইল না। লাভের মধ্যে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইল। অতঃপর নিরাশহৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে এক পরম জ্ঞানী যোগীপুরুষের দর্শন পাইয়া অশ্রুজলে তাঁহার পাদদেশ প্লাবিত করিয়া আপন দুঃখের কথা নিবেদন করিল। যোগী পুরুষ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার রাজা ভ্রান্ত, তিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন উহা রূপক মাত্র, সেই তরু অকৃতি বিশিষ্ট সাধারণ তরু নহে, উহা জ্ঞানতরু। কখন উহার নাম বারিধি, কখন মহার্ণব, কখন বা ঐরূপ অন্য কিছু।" ইহা শুনিয়া তাহার চৈতন্য জন্মিল। সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল এবং করযোড়ে সম্রাটের সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন সম্রাটেরও জ্ঞানোদয় হইল। এইরূপ শত শত উপন্যাসাদি দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, রূপক ব্যবহারের রীতি সামান্য আখ্যায়িকা কথন-

স্থলে ও অবলম্বিত হইত এবং অদ্যাপিও হইয়া থাকে। অতএব উল্লিখিত বিশিষ্ট কারণ গুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে যে আর্য্য শাস্ত্রকার গণ রূপক ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই তাঁহারা দোষী হইতে পারেন না। যাহাহউক, এখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, কখনও কোন দুরূহতত্ত্ব অজ্ঞ দিগের স্থূলদৃষ্টির অতীত স্থানে সংরক্ষার জন্য, কখনও বা বিষয়ের উচ্চতা রক্ষার জন্য এবং কখনও বা তাদৃশ অন্য কোন কারণ জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক বিষয়কে অতিরঞ্জিত বা রূপকাবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ফলতঃ যেরূপ উদ্দেশ্য-প্রেরিত হইয়াই কেন তাঁহারা ঐরূপ পন্থাবলম্বন না করিয়া থাকুন, তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্যের মূলে যে সততা ও জগদ্ধিতৈষিতা নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যতই অভিনিবিষ্ট-চিত্তে শাস্ত্রনিচয়ের মর্ম্মাবধারণে যত্নপর হই, যতই শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার উদ্দেশ্যাবধারণে অভিনিবিষ্ট হই, ততই জাজ্জ্বল্যতর রূপে তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য ও মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে থাকি। বাস্তবিক, কোনও দেশীয় কোনও শাস্ত্রকার কোনও কালে যে এতদূর জগদ্ধিতৈষণা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ক্ষণেকের তরেও তাহা মনে করিতে পারি না। অতএব আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাঁহাদিগকে যত কেন স্বার্থপর মনে না করি, যত কেন কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া

বিশ্বাস না করি, কিন্তু সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমাদের এই দৃষ্টি নিতান্তই স্থূল, নিতান্তই বহির্দ্দেশ-দর্শী, সুতরাং নিতান্তই ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কাধীন। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে কি তাঁহাদের প্রণীত বা সংগৃহীত শাস্ত্রাদির সম্বন্ধে কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, আমরা যেন এইরূপ একদেশ-দর্শী ভাব দ্বারা চালিত হইয়া ভ্রমে পতিত না হই। সর্ব্বদাই যেন সূক্ষ্মদৃষ্টির এবং সাধু ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকল বিষয়ের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে উত্তরোত্তর আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব যে, তাঁহারা বাস্তবিকই জগদারাধ্য মহাপুরুষ ছিলেন, এবং জগতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের জীবনের প্রধানতম ব্রত ছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মনীতি।

আর্য্য জাতির যে সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের অনুসরণে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও পরিবর্জ্জনে স্বাস্থ্যের হানি হইবার একান্ত সম্ভাবনা, এই পরিচ্ছেদে তৎসমস্তই সমালোচিত হইবে। এই অধ্যায়-বিবৃত আচার ব্যবহারাদির সহিত পরিবার বা সমাজ কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ নহে, প্রত্যুত যথেষ্টই আছে। তবে স্বাস্থ্যের সহিতই এই সমস্ত আচার ব্যবহারাদির সংস্রব অধিকতর, স্বাস্থ্যই ইহাদের প্রধানতম লক্ষ্য এই মাত্র। এস্থলে এরূপ বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রচলিত দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নহে। উহা বিভিন্ন জাতীয়দিগের সহিত সংস্রবে বহু পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রূপ রূপান্তর-প্রাপ্তি স্বাভাবিক। কেননা, যাহাদিগের সংসর্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে হয়, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থ বহু বিষয়ের জন্য যাহাদের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে

হয়, লক্ষিত ভাবেই হউক আর অলক্ষিত ভাবেই হউক, তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি বহু পরিমাণে অবলম্বন না করিয়া থাকা যাইতে পারে না। হিন্দু সমাজের উপর দিয়া যখন বহু বিপবের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তখন প্রতি স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সমানীত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে যে সমস্ত অন্তর্ব্বিপব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা আচার ব্যবহারাদির অধিক রূপান্তর হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না। কেননা, এদেশের সমস্ত রাজাই আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং এক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া যে স্থলে অপরের রাজত্ব হরণ করিয়া লইতেন, সে স্থলে তাঁহাকেও সেই একই শাস্ত্র-বিধিরই অনুযায়ী হইয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিষয় বিশেষে বিভিন্ন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলেও মূল নীতি সম্বন্ধে কোথায় ও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। অতএব দেশীয় রাজগণের শাসনাধীন থাকা সময়ে যখন কোন রাজ্য এক রাজার হস্ত হইতে অপরের হস্তগত হইয়াছে, তখন তদ্দ্বারা আচার ব্যবহারাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় রাজগণের শাসনাধীনে থাকিবার সময়ের কথা পৃথক্।

ভিন্ন দেশীয় রাজগণের মধ্যে প্রথমে মুসলমানগণ অনন্তর ইংরেজগণ রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ়

হইয়া ছিলেন। উভয় রাজ বংশই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত এবং হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত মুসলমান ও ইংরেজ দিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের এত অনৈক্য যে বহু বিষয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত আচার ব্যবহার সম্পন্ন রাজ পুরুষ দিগের শাসনাধীনে অবস্থান নিবন্ধন যে বাধ্য হইয়া হিন্দু দিগকে স্বজাতীয় আচার ব্যবহার অনেক স্থলে শিথিল এবং কতক কতক স্থলে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুধু ইহাই নহে, কতক কতক স্থলে বাধ্য হইয়া রাজপুরুষ দিগের আচরণ অবলম্বন ই করিতে হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখনই যে দেশে যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে, তখন ই সেই দেশের পূর্ব্বতন রীতি নীতির শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাজ পুরুষ দিগের অবলম্বিত রীতি নীতি কতক পরিমাণে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। বাস্তবিক যিনি রাজা বা যাঁহার হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত আছে, যাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, অধিক কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে, তাঁহার অবলম্বিত এবং প্রিয় রীতি নীতির অনুসরণ দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন করিবার ইচ্ছা সকলেরই জন্মিবার বিষয়। তবে, যে সমস্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ধার্ম্মিক জন ধন প্রাণের, স্ত্রী পুত্রের মমতা দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা রাজার বা রাজ পুরুষ

দিগের ভ্রূভঙ্গিতে ভীত হইয়া, স্বকীয় বিশ্বাসের বা ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ না করিতে পারেন। কিন্তু, তাদৃশ মহা[illegible] সংখ্যা অতি বিরল। অতএব, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনাধীনতায় নিরন্তর আর্য্য রীতি নীতির যে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটি[illegible]াছে, তাহা অবাধে স্বীকার করা যাইতে পারে। [illegible]আবার, এই যে ভিন্নধর্ম্মী রাজগণের শাসন ইহাও [illegible] বা শতবর্ষ-ব্যাপী নহে, যে [illegible] প্রভাব তাদৃশ [illegible]বান হইবে না।। যে দিন হইতে ক্রূরমতি দুরাত্মা মহম্মদ ঘোরী জম্বুক চাতুর্য্যে হিন্দু-কুল-তিলক পৃথ্বী রাজের প্রাণ সংহার করিয়া ভারতের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিল, সেই অশুভদিন হইতে আজি সপ্ত শত বৎসর অতীত হইল। যদি প্রত্যেক জীবিত কালের গড়-পরিমাণ ঊর্দ্ধ কল্পে চত্বারিংশ-বর্ষ ও গণনা করা যায়, তথাপি এই সুদীর্ঘ কালে সপ্তদশ পুরুষ অতীত হইয়া গিয়াছে! দুই এক পুরুষ ভিন্ন জাতীয় দিগের সংশ্রবে অবস্থিতি করিলেই কত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা,. আর এ সপ্তদশ পুরুষ! ভয়ানক কথা! এই যুগান্তর-সদৃশ-দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংঘর্ষে যদি সমস্ত রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া একবারে রাজপুরুষদিগের অনুরূপে গঠিত হইয়াও যাইত তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। বরং তদ্রূপ হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর ছিল। কিন্তু, ধন্য আর্য্য মনীষিগণ! ধন্য তাঁহাদের নীতি কৌশল! এই সুদীর্ঘ কালেও

তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত নীতি একবারে বিধ্বস্ত বা আমূল পরিবর্ত্তিত হয় নাই—এত ঝঞ্ঝাবাতের পরেও তৎসমস্তের ছায়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখনও অনুসন্ধিৎসু চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে প্রকৃত আচার ব্যবহারের ছায়া স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেপারে। এখনও সমাজ-প্রচলিত আচার ব্যবহার গুলির গায়ে আর্য্যগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। এই যে দীর্ঘস্থায়িত্ব, এই যে সুদূরপরাহত কাল হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অস্তিত্ব, ইহাই আর্য্য রীতি নীতি নিচয়ের বিশুদ্ধতার জ্বলন্ত প্রমাণ। যে সমস্ত রীতি নীতি সত্যের অক্ষয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কখনই যুগ-যুগান্ত কাল তিষ্ঠিতে পারে না। আর্য্য নীতি সমূহের এই মৌলিক বিশুদ্ধতাই আমাদিগকে তৎসমস্তের মূল-নির্দ্ধারণে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। আমরা তজ্জন্যই বর্ত্তমান প্রচলিত আচার ব্যবহার গুলির বিকৃত ভাব দর্শনেও হীনসাহস না হইয়া তাহাদের প্রকৃত তত্ত্বনিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছি। বলা বাহুল্য ঐরূপ প্রকৃত তত্ত্বনিষ্কাশনে আমাদিগকে আর্য্য সমাজের প্রাচীন কালীয় অবস্থার দিকেই অভিনিবেশ করিতে হইবে—প্রাচীন কালীয় সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি স্বরূপ সংহিতা পুরাণাদির অন্তস্তল-নিহিত সত্যগুলিরই সমুদ্ধারে যত্ন করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব আমরা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আর্য্য জীবনের কার্য্যাবলীর যথাযথ চিত্র প্রদান

করিতে হইলে তাঁহাদের কর্ম্মবিভাগ পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে কর্ম্ম ত্রিবিধ ঃ— নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক (১)। কতক গুলি কার্য্য এমত আছে যে গৃহস্থ মাত্রকেই তাহা যাবজ্জীবন প্রতিদিন করিতে হয়, সেই গুলির নাম নিত্যকর্ম্ম। কতকগুলি কার্য্য কেবল নিমিত্ত-বিশেষে অর্থাৎ প্রয়োজন মতে সম্পন্ন করিতে হয়, সেই গুলির নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। অপর কতকগুলি কার্য্য এমন আছে যাহা নিত্যও নয়, নৈমিত্তিকও নয়, অথচ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত ইহাদিগের নাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্য কর্ম্মের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, নিত্য কর্ম্মের ন্যায় যাবজ্জীবন ব্যাপিয়া প্রতিদিনই ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। নৈমিত্তিকের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, এসমস্ত নৈমিত্তিকের ন্যায় মাত্র প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একবার করিলেই চলিতে পারে না; যাবজ্জীবনই প্রয়োজন উপস্থিত স্থলে ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম কি কি, ইহা নির্দ্ধারণ স্থলে শাস্ত্রকার গণ কহিয়াছেন ঃ—ব্রহ্ম যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞই গৃহস্থের নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম(২)

১। নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্য নৈমিত্তিকন্তথা।
গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

২। ব্রহ্ম যজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দৈব যজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃ যজ্ঞো ভূত যজ্ঞঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
পাদ্মে ক্রিয়া যোগসারে। ১৬শ অধ্যায়।

"ব্রহ্ম যজ্ঞ" অর্থ বিধি পূর্ব্বক বেদবিদ্যাধ্যয়ন; "নৃযজ্ঞ" অর্থ অতিথিসেবা; "দৈব যজ্ঞ" অর্থ হোম; 'পিতৃ যজ্ঞ, অর্থ তর্পণ, শ্রাদ্ধ; এবং "ভূতযজ্ঞ" অর্থ বলি-বৈশ্বদেব-কর্ম্ম অর্থাৎ জীব ও বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে খাদ্যোৎসর্গ। এই সমস্ত নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মের অকরণে নানাবিধ দোষ-শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে; এমন কি এতদূর পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে যে, কোন গৃহস্থ যদি একবৎসর কাল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহা হইলে সে এমনি পাতকী বলিয়া বিবেচিত হয় যে, সাধুগণ তাহাকে দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে সূর্য্য দর্শন করিবেন এবং স্পর্শ করিলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিবেন(১)। নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠানেও এইরূপ দোষশ্রুতির উল্লেখ হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মস্থলে যে পঞ্চ মহা যজ্ঞের নামোল্লিখিত হইয়াছে তৎসমস্ত কেবল মুখ্য লক্ষ্য মাত্র। ঐ সমস্ত লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে যে অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে সমস্ত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান ও সুতরাংই নিত্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত

---

(১)। সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোহভি জায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা॥
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্ম্মহামুনে।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ॥
বিষ্ণু পুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮শ অধ্যায়।

হইতেছে। যেমন, উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের অন্যতম, দৈব যজ্ঞ অর্থাৎ হোম। এই হোমক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ সমিধাদি সংগ্রহ আবশ্যক। সুতরাং সমিধাদি সংগ্রহও নিত্যকর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত হইতেছে। অপর, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান প্রভৃতি কতক গুলি কর্ম্ম এমন আছে যাহা ধর্ম্ম্য ও নিত্যা নুষ্ঠেয়। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম স্থলে যে পঞ্চ যজ্ঞের নামোল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত কর্ম্ম গৃহীত হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও ঐসকল কার্য্য ধর্ম্ম্য ও অবশ্যানুষ্ঠেয় তথাপি উহারাই মূল লক্ষ্য-কার্য্য নহে, লক্ষ্য সাধনের হেতুভূত পন্থাবিশেষ মাত্র;বিশেষতঃ ঐ সমস্ত কার্য্য বহু পরিমাণে স্বভাবের প্রণোদনা হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উহাদের অনুষ্ঠান না করিলে স্বাস্থ্যই নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং উহাদিগকে ঐ রূপ যজ্ঞবিশেষ না বলিলেও কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠানের ত্রুটীর সম্ভাবনা অনেক অল্প। অতএব স্থূলতঃ ঐ পঞ্চ-যজ্ঞ মাত্র নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিলেও, বহু বিধ অন্যান্য কর্ম্মও নিত্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। নৈমিত্তিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ রূপ।

অতঃপর, এই যে ত্রিবিধ কর্ম্ম, ইহার প্রত্যেকটী আবার সত্ত্ব, রজঃ, তম এই গুণ ত্রয় ভেদে তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়াই করা হয়, যাহার অনুষ্ঠানে অনুরাগ বা দ্বেষ কিছুই নাই এবং যাহাতে ফলকামনা করা হয় না তাহা সাত্ত্বিক;

যাহার অনুষ্ঠানে অহঙ্কারের ভাব এবং ফল কামনা আছে তাহা রাজসিক এবং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভাবী শুভাশুভ গণনা, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষের পর্য্যালোচনা নাই, মোহই যাহার প্রণোদক সেই কর্ম্ম তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (১)। এই নাম নির্দ্দেশ দ্বারাই কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্বাদি সূচিত হইতেছে; অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রাজসিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা যে মধ্যম এবং তামসিক ভাব প্রেরিত হইয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহা যে নিকৃষ্ট, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, আর্য্যগণ সর্ব্বথা সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্যই পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্য জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যকে উক্ত রূপ বিভাগের অধীন করিয়া তাহাদের সমালোচনা করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। এমন কি, বহু কার্য্য এমন দৃষ্ট হয়, যাহা কোন্

১। নিয়তং সঙ্গরহিত মরাগ দ্বেষতঃ কৃতং।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্যচ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮শ অধ্যায়। ২৩। ২৪। ২৫। শ্লোক

শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া বিধেয়, তাহা নির্দ্ধারণ করাও সহজ নহে। বিশেষতঃ, তদ্রূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রত্যেক কার্য্যের সমালোচনা এরূপ ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থে সম্ভবপরও নহে। অতএব আমরা সমালোচন স্থলে কোন্ কার্য্য কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা নির্দ্ধারণে প্রয়াস না পাইয়া মাত্র তত্তৎকার্য্যের উপযোগিতারই উল্লেখে যত্নপর হইব।

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। নিত্যকর্ম্ম সমূহ সমস্ত জীবন ব্যাপিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয়। কাল দেশ পাত্র ভেদে সময় সময় উহার বিকল্পের বিধান থাকিলেও তাহা ক্ষণিক মাত্র। তাদৃশ বিকল্পের কারণ দূর হইলেই আবার উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বাধ্যকর হইয়া উঠে। যখন উক্তরূপ কর্ম্ম সমুদায় সমস্ত জীবন ব্যাপিয়াই অনুষ্ঠেয়, তখন ইহা নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতে পারে যে, ইহাদের সহিতই জীবন ঘনিষ্ঠতম ভাবে সম্বদ্ধ। বাস্তবিক এই অনুমান কার্য্যতঃ ও সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে, এই নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনের উপরই আর্য্য জাতির উন্নতির প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত ছিল। এতদ্দ্বারা আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, নিত্যকর্ম্ম গুলিই মাত্র সারগর্ভ ছিল, নৈমিত্তিক কি উভয়াত্মক (নিত্য-নৈমিত্তিক) কর্ম্ম সমূহের কোন উপযোগিতা ছিল না। আমরা মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে, সমস্ত কার্য্যেরই উপযোগিতা আছে সত্য, কিন্তু, তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সমূহের উপযো

গিতা কিছু অধিকতর। ইহাও সাধারণ ভাবের কথা। নচেৎ, অপর দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যেও এমন কোন কোন কর্ম্ম দৃষ্ট হইবে, যাহার গুরুত্ব অনেক নিত্যকর্ম্ম হইতেও অধিকতর (১)। যাহা হউক নিত্যই হউক কি নৈমিত্তিকই হউক, আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য কেবল বিষয়ের গুরুত্ব প্রদর্শন। যে কর্ম্মেরই উপযোগিতা অধিকতর পরিদৃষ্ট হইবে, তাহা যে শ্রেণীরই কেন অন্তর্গত না হউক, আমরা তাহারই উপযোগিতা প্রদর্শনে অধিকতর যত্নপর হইব। তবে সমষ্টিতঃ নিত্য কর্ম্মের গুরুত্বই অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য আমরা তৎসমস্তেরই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

আর্য্যগণ নিত্যকর্ম্ম সমুদায়ের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ দিবাভাগকে অষ্ট যামার্দ্ধে ও রাত্রি ভাগকে অষ্ট যামার্দ্ধে অর্থাৎ সমগ্র অহোরাত্রকে ষোড়শ যামার্দ্ধে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যামার্দ্ধের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা ও তাঁহাদেরই পন্থানুবর্ত্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্য নিচয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ অগ্রপশ্চাদ্‌বর্ত্তিতা রক্ষা করিয়া চলিতে যত্নপর হইব।

১। এস্থলে মাত্র স্বাস্থ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই কর্ম্ম সমূহের গুরুত্বাদি বিবেচিত হইতেছে।

প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য।

নিশাবসানে বিহঙ্গমগণ যখন কলকণ্ঠ বাজাইয়া বিশ্ব নিয়ন্তার জয় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে, প্রাচী সতী যখন লোহিতবাসে স্বর্ণ কান্তি আবৃত করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে থাকেন, প্রাতঃসমীরণের সুধাময় স্পর্শে মৃত জগতে যখন ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চারের সূচনা হয়, আর্য্যগণ সেই মনোরম মুহূর্ত্তের নাম "ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত" রাখিয়াছেন। অরুণোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডদয়-পরিমিত কাল উহার স্থায়িত্ব। ঐ পবিত্র সময় পরব্রহ্মের পবিত্র নাম স্মরণের একান্ত অনুকূল, তাই উহা ঐ পবিত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পবিত্র সময়ে জাগ্রত হইয়া আর্য্যগণ ভক্তি-বিগলিত-হৃদয়ে বিশ্বপতির ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতেন (১)। সমস্ত দিন যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সমস্ত রাত্রি যাঁহার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিয়াছেন, যাঁহার মঙ্গল হস্ত তাঁহাকে রাত্রির বিপৎসঙ্কুল সময়ে রক্ষা না করিলে তিনি কোন্ সময় কোথায় উড়িয়া যাইতেন, এই শুভ সময়ে সেই মঙ্গল-সঙ্কল্প বিধাতার গুণানুকীর্ত্তন করিতে তাঁহার কৃতজ্ঞ হৃদয় কেন না ব্যগ্র হইবে? এক বিন্দু উপকার লাভ করিলেই যে হৃদয় উপকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা

---

(১) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
কায় ক্লেশন্তদুদ্ভূতং ধ্যায়েত্তু মনসেশ্বরং ॥
কূর্ম্ম পুরাণ, উপবিভাগ, ১৭শ অধ্যায়।

প্রকাশে ব্যগ্র হয়, সেই কৃতজ্ঞতা-প্রবণ আর্য্যহৃদয় সর্ব্বসুখ-বিধাতা, সর্ব্বশুভ-প্রেরয়িতা জগদীশ্বরের মঙ্গল হস্তের অসীম দানের বিষয় ভাবিয়া কেনই না কৃতজ্ঞ হইবে? কেনই না কৃতজ্ঞতার পবিত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে? আবার ওদিকে, সম্মুখে ঘোর সংসার সমুদ্র; উহার ফেণিল তরঙ্গের ভয়াবহ শব্দে অন্তরাত্মা একেবারে ভীতি-বিহ্বল হইয়া উঠে! কাহার সাধ্য স্বকীয় ক্ষুদ্র বলের প্রতি নির্ভর করিয়া উহার বিশাল বক্ষে মনতরি ভাসমান করে? কাহার সাধ্য বিশ্বাধিপের অনন্ত বলের উপর নির্ভর না করিয়া অক্ষতমনঃপ্রাণে ঐ সমুদ্র বক্ষে ত্রাণ পাইতে পারে? ঐ বিশাল সমুদ্রের বহ্বায়ত বক্ষে প্রলোভনের কত মগ্নগিরি লুক্কায়িত রহিয়াছে, কাহার সাধ্য সেই ভবকর্ণধারের নিরাপদ ইঙ্গিত ব্যতীত তাহার সংঘর্ষ হইতে দুর্ব্বল মনতরি রক্ষা করে? তাই নিদ্রাবসানে, যখন মন সংসারের গুরুভারে প্রপীড়িত হয় নাই, বরং শ্রান্তি-বারিণী নিদ্রা যখন তাহাকে শ্রমজনিত ক্লান্তি হইতে মুক্ত করিয়া তাহার বলবিধান করিয়াছে, আর্য্যহৃদয় তখন সেই মঙ্গলময় বিধাতার চরণোপান্তে বিনীত ভাবে আধ্যাত্মিক বল ভিক্ষা করে এবং সেই স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়।

অনন্তর, আর্য্যহৃদয় প্রাতঃস্মরণীয় দিগের নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হয়। এই সুখময় প্রভাত কালে যাঁহা-

দিগের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে (১), তাঁহাদের জীবন অলৌকিক ধর্ম্মভাবে, অমানুষিক পুণ্যভাবে দীপ্তিমান। জ্ঞান-চক্ষে তাঁহাদের পবিত্র জীবন সন্দর্শন করিলে, তাঁহাদের অচল ধর্ম্মভাব, অটল বিশ্বাস, অক্লান্ত সহিষ্ণুতা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে, সংক্ষেপতঃ, তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় জীবনকে আমাদের পাপান্ধকারময় জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে নিযুক্ত করিতে পারিলে, ঘোর বিপৎসঙ্কুল সংসারারণ্যে বহু পরিমাণে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করা যাইতে পারে। যখন পাপ-প্রলোভন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হয়, তখন যদি আমরা ঐ মহাত্মগণের দেব-ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি, তাহা হইলে উহার ঐ মোহিনী মায়া আর আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; আমাদের গন্তব্য

১। পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

(ক)। ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাশ্চ মনুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ সগৌতমঃ।
রৈভ্যো মরীচিশ্চ্যবনো রিভুশ্চ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
সনৎ কুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ সনাতনোঽপ্যাসুরিপিঙ্গলৌচ।
সপ্তস্বরাঃ সপ্তরসাতলাশ্চ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে-মম সুপ্রভাতং॥
বামণ পুরাণ। ১৪শ অধ্যায়।

(খ)। মতান্তরে, শয্যা হইতে উত্থানান্তর, কর্কোটক, ঋতুপর্ণ, নল, দময়ন্তী এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নামস্মরণ ব্যবস্থিত হইয়াছে।
রঘুনন্দন কৃত আহ্নিকাচার তত্ত্ব।

পথে আর উহা পরিপন্থী হইতে সাহসী হয় না। যখনই জীবন-সংগ্রামের ভয়ানক-দৃশ্য-দর্শনে মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তখনই যদি আমরা ওই দেবচরিত মহাত্ম-দিগের অটল সাহস ও অক্লান্ত সহিষ্ণুতার দিকে প্রণিধান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ঐ ভীষণ সংগ্রাম আর ভীষণ বলিয়া প্রতীত হয়না; উহার ভীষণতা কোমলতায় পরিণতি পাইয়া যায়, উহা প্রিয়-বন্ধুর শুভ-সমাগমের ন্যায় আনন্দ-বিধায়ক হইয়া উঠে। এই সাধু অভিপ্রায়েই পুণ্যশ্লোকদিগের নামোচ্চারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

পুণ্যশ্লোকদিগের নাম-নির্দ্দেশ-স্থলে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত ও জগতে অনেক সাধুপুরুষ ও সাধ্বী নারী পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়া তাঁহাদের মহজ্জীবনের জ্বলন্ত প্রতিকৃতি আমাদের সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে পুণ্যশ্লোকস্থলে তাঁহাদের নাম ও গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, উক্তরূপ নাম-নির্দ্দেশের লক্ষ্য ইহাই নহে যে, ঐ অল্পসংখ্যক দেবজীবন ব্যতীত জগতে আর কোন ও জীবন ঐ রূপ পূজিত হইবার যোগ্য নহে, প্রত্যুত উহার উদ্দেশ্য ইহাই বোধ হয় যে, আমরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য দেবচরিত পুরুষ ও মহিলা-দিগের প্রতিও ঐরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিব এবং এইরূপে তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনকে আদর্শরূপে

সম্মুখে ধারণ করিয়া স্ব স্ব জীবন সংগঠিত করিব। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা স্বর্গগত মহাত্মা রাজা রামকৃষ্ণ ও ভগবদ্‌ভক্তি-পরায়ণা রাণী ভবানী এবং অহল্যা বাইর নামোল্লেখ করিতে পারি। ইঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়গণের নামের সহিত শ্লোকবদ্ধ হয় নাই সত্য, কিন্তু অনেকে পুণ্য-শ্লোক দিগের ন্যায় ইঁহাদের নামও রীতিমত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, দেবচরিত্র পুরুষ ও মহিলা মাত্রেরই যে নামোচ্চারিত হওয়া অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জগতে সহস্র সহস্র সাধু সাধ্বী জন্মগ্রহণ করিয়া কি রূপে পবিত্রতা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের অত্যল্প সংখ্যকেরই নামগ্রহণে অবকাশ প্রাপ্ত হই; তাই, মাত্র অল্প সংখ্যকেরই নাম শ্লোক মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, অল্প বা অধিক সংখ্যকের নাম গ্রহণের মধ্যে শুভাশুভ কিছুই বিশেষ নির্ভর করে না। যদি আমরা হৃদয়ের সহিত একটী মাত্র দেবজীবনকেও আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে যত্নপর হই, তাহাতেও যথেষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা। আর যদি প্রাণের সহিত অনুসরণ করিতে সচেষ্ট না হই, যদি মাত্র রীতিরক্ষার অনুরোধেই নাম গ্রহণ করি, তাহা হইলে জগতের সমস্ত মহাপুরুষগণের নাম গ্রহণেও কিছু মাত্র ফলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা এমনই ভ্রান্ত, এমনই তত্ত্ব-চিন্তন-বিমুখ যে, এই মঙ্গলকরী প্রথার মুখ্য

উদ্দেশ্য যে কি তাহা ভ্রমেও ভাবিয়া দেখি না। ভ্রমে ইহার মূলানুসন্ধানে মনোনিবেশ করি না। কেবল শিক্ষিত শুক পক্ষীর ন্যায়—অর্থগ্রহ নাই, ভাবগ্রহ নাই—শব্দ কয়েকটী আবৃত্তি করি; লহরীযন্ত্র নাম গুলিকে উচ্চারণ করিয়া শুভ কর্ত্তব্যের সম্পাদন করি কিন্তু, ঐ সমস্ত নাম-প্রতিপাদ্য দেবপুরুষ এবং মহিলাগণের আভ্যন্তরীণ জ্যোতির এক বিন্দুও হৃদয়ে ধারণ করিতে যত্নপর হই না।

গাত্রোত্থান।

আর্য্যপুরুষ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া ঈশ্বর এবং পুণ্যশ্লোক দিগের নামোচ্চারণ করিলেন বটে, কিন্তু, ইহাতেই তাঁহার ঐ শুভ-মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। তাঁহাকে ঐ মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানও করিতে হইবে। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন্ না কেন, অপ্রতিবিধেয় কারণ ব্যতিরেকে তাঁহার এই মুহূর্ত্তে শয়ান থাকিবার অধিকার নাই। যদি তিনি প্রচুর কারণ না থাকা সত্ত্বেও সূর্য্যোদয়ের পরে গাত্রোত্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, অন্যথা তিনি মহাপাতকগ্রস্ত হইবেন (১)। সত্য বটে, শাস্ত্রকারগণ এই নিয়মটী শুধু ব্রহ্মচারী দিগের জন্যই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, কার্য্যতঃ ইহার

(১) সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥

মনু ২। ২২১।

ফল সুধু ব্রহ্মচারী দিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমস্ত দ্বিজাতি সমাজেই ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মচারীগণ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন (১)। এই সুদীর্ঘ কালে তাঁহাদের যে যে রূপ অভ্যাস সঞ্জাত হয়, পর জীবনে ও অধিকাংশস্থলে তদ্রূপ অভ্যাসই রহিয়া যাওয়ার একান্ত সম্ভাবনা। আর সুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত রহেন নাই, তাঁহারা তজ্জন্য কঠোর শাসন বাক্যও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পরে দন্ত ধাবন করে সে এমনই পাপিষ্ঠ যে, "আমি জনার্দ্দনের পূজা করি,, এরূপ বলিবার পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার নাই (২)। মনুসংহিতায় সন্ধ্যা বন্দনার সময় ও মাহাত্ম্য-বর্ণনস্থলে উক্ত হইয়াছে,ঃ—সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যা জপ করিবে এবং যে পর্য্যন্ত নক্ষত্র নিকর সম্যক্ রূপে দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত সায়ং সন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃ সন্ধ্যায় জপকারী ব্যক্তি রাত্রিকৃত পাপ এবং সায়ং সন্ধ্যায় জপকারী ব্যক্তি দিবা কৃত পাপ ধ্বংস

---

(১) উপনয়ন-বিধি-সমালোচন-স্থলে দ্রষ্টব্য।

(২) উদিতে জগতো নাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনং।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াৎ পূজয়ামি জনার্দ্দনং॥

মহাজন-গৃহীত বাক্য।

করেন (১)। শাস্ত্রকারগণ প্রত্যুষে উত্থান সম্বন্ধে এই রূপ বহুবিধ ফল শ্রুতি এবং বিলম্বে উত্থান সম্বন্ধে এই রূপ বহুবিধ দোষশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ প্রত্যূষে অনুত্থান ও উত্থান সম্বন্ধে এরূপ পাপ পুণ্যের ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন কেন? ইহা কি তাঁহাদের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত কুসংস্কার মূলক সিদ্ধান্ত নহে? শীঘ্র বা বিলম্বে উত্থান, ইহাতে পুণ্য বা পাপের কি সংস্রব থাকিতে পারে? স্থূল দৃষ্টিতে সহজেই মনোমধ্যে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের তত্ত্বদর্শী চক্ষুতে দৃষ্টি করিতে যাই, তাহা হইলে, উহার মূলে, গভীর সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাই। তখন বুঝিতে পারি, ভ্রম ও কুসংস্কার উহার চতুঃসীমায়ও প্রবেশ পথ পায় নাই; তখন স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করি, ঐরূপ পাপ পুণ্য, ভয় প্রলোভনাদির মূলে "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং, এই মহামন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। তখন বুঝিতে পারি, এই পাপ পুণ্যাদির ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শনের একমাত্র তাৎপর্য্য জন সাধারণকে বিলম্বে উত্থানে নিবৃত্ত এবং প্রত্যূষে উত্থানে প্রবৃত্ত করা, এবং এইরূপে তাহাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপায় বিধান করা। যিনি এই সমস্ত

---

(১) পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমর্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমান্ত সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষ বিভাবনাৎ॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠৈন্‌শ মেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্ত সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং॥

মনু, ২য় অধ্যায়, ১০১। ১০২।

নিষেধ ও বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন-পদ্ধতি নিয়মিত করেন, তিনি অবশ্য শুভ ফল লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি ইহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি অবশ্যই অশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখন আমাদের দেখা আবশ্যক, প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের যে এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে কি বলেন।

সকলেই অবগত আছেন, বৃক্ষনিচয় সমস্ত রাত্রি কার্ব্বণ্ (অঙ্গারজান) নামক বাষ্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পরে যতই রাত্রি অবসান হইতে থাকে, ততই অঙ্গারজানের পরিবর্ত্তে অক্সিজেন (অম্লজান) পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে, পরে প্রত্যুষ হইতে কার্ব্বণ্ পরিত্যাগ একবারেই বন্ধ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করিতে থাকে। অঙ্গারজান যেমনি জীবগণের পক্ষে মহামারাত্মক, অম্লজান আবার তেমনি প্রাণ প্রদ। একটী ভেক বা মূষিক কে যদি কোন ক্রমে ধরিয়া কোন্ অঙ্গারজান পূর্ণ পাত্রের নিকট এমন ভাবে স্থাপন করা যায় যে, তাহার নাশা রন্ধ্র দ্বারা ঐ অঙ্গারজান শরীরস্থ হয়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত না যাইতেই তাহার জীবনী শক্তি শিথিল এবং শরীর বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করে এবং অচিরেই মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়। পরে যদি আবার ঐ মৃতকল্প জন্তুটীকে একটী অম্লজানপূর্ণ পাত্রের নিকট পূর্ব্ববৎ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহার সেই অবসন্ন জীবনক্রিয়া আবার সাম্য

বন্ধ হয়, শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ পুনরাগত হয় এবং মৃত্যু লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায় (১)। মনুষ্যের সম্বন্ধে ঠিক্ একই কথা। অতএব যে কার্ব্বন এক্ষন মারাত্মক তাহা হইতে দূরে থাকিয়া প্রাণ বায়ু অক্সিজেন সেবনার্থ যাত্নিক হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলে অনায়াসে এই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে। এই সময়ের সুস্নিগ্ধ বায়ুর সহিত অক্সিজেন সম্মিলি

(১) জীবগণের ন্যায় বৃক্ষদিগেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে। জীবগণ যেমন বহির্ব্বায়ু আকর্ষণ করিয়া লয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহা বহিস্কৃত করিয়া দেয়, উদ্ভিদ্‌গণও অবিকল তাহাই করে। কিন্তু উভয়ের কার্য্যের পদ্ধতি এক হইলেও কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত। জীব যাহা প্রাণবায়ু বলিয়া গ্রহণ করে, বৃক্ষ তাহা প্রাণনাশক বলিয়া পরিত্যাগ করে এবং বৃক্ষ যাহা প্রাণপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করে, জীব তাহা জীবন হর বলিয়া পরিত্যাগ করে। বাস্তবিক, জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ পরস্পরে জীবন রক্ষার মহামূল্য যন্ত্র স্বরূপ। একটী সর্ব্বদাই অজ্ঞাতসারে অপরের প্রাণ রক্ষার্থ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে আপনারও প্রাণ রক্ষা করিতেছে। জীবগণ নিশ্বাসযোগে যে বায়ু গ্রহণ করিতেছে, তাহার অম্লজান নামক অংশ তাহার রক্তবিশোধন ক্রিয়া সমাপন করিয়া রক্তস্থ দূষিত-পদার্থ-সহযোগে আপনি কার্ব্বনে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতেছে। এদিকে বৃক্ষগণ আবার এই জীব পরিত্যক্ত কার্ব্বন্‌কে প্রাণবায়ুরূপে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধি পুরঃসর উহাকেই আবার অক্সিজেনে পরিণত করিয়া জীবজগতের হিতার্থে প্রেরণ করিতেছে। জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জগতে এই যে আশ্চর্য্য বিনিময় কার্য্য চলিতেছে, ইহাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে, নচেৎ হইলে কোন্ কালে অক্সিজেনের প্রাচুর্য্যে উদ্ভিজ্জগৎ কিম্বা কার্ব্বনের আধিক্যে জীবজগৎ উৎসন্ন হইয়া যাইত।

হইয়া উহার স্বাস্থ্য-সঞ্জীবনী-শক্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বোধহয় এই নিমিত্তই প্রত্যূষ সময়ের বায়ুকে "বীরবায়ু" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

অপর, রাত্রিতে রুদ্ধদ্বার গৃহে শয়ান থাকাতে প্রশ্বসিত বায়ুস্থ অঙ্গারজান বহির্গত হইতে পথ না পাইয়া গৃহস্থ বায়ুরাশিকে দূষিত করিয়া ফেলে। যত শীঘ্র ঐ দূষিত বায়ু হইতে বিশুদ্ধ বায়ুতে গমন করা যায় ততই উত্তম। কিন্তু, তাই বলিয়া অধিক রাত্রি থাকিতে উত্থান করা যুক্তি সঙ্গত নহে। কেননা, একেত তখন বায়ুরাশি বৃক্ষ পরিত্যক্ত কার্ব্বনে দূষিত থাকে, তাহাতে আবার নৈশ-শিশির-সম্পাতে উহা অধিক মাত্রায় শৈত্যগুণ বিশিষ্ট থাকে। এদিকে বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ু উষ্ণ ও রুক্ষভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করে। অতএব কি রাত্রি, কি দিবা, কোন সময়ই প্রত্যূষ সময়ের ন্যায় গাত্রোত্থান সম্বন্ধে অনুকূল নহে। এই সমস্ত কারণেই শাস্ত্রকারগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ভূমিতে পাদবিক্ষেপ ও চক্ষুতে জল প্রক্ষেপ।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই আর্য্যগণ "নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে,,—অভিলষিতদাত্রী পৃথিবীকে নমস্কার— এই বাক্যে পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া ভূমিতে পাদ বিক্ষেপ করিতেন। পৃথিবী নির্জ্জীব জড় পদার্থ, তাহার প্রাণ নাই, জ্ঞান নাই; চেতনা নাই, বোধশক্তি নাই;

তাহাকে নমস্কার কেন ? যে, কটুবাক্যে মর্ম্মাহত কি অভিসম্পাতে মর্ম্মপীড়িত হয় না ; প্রিয় বচনে প্রসন্ন কিংবা আশীর্ব্বচনে পুলকিত হইতে পারে না, তাহাকে প্রণাম করিলে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে ? সে প্রাণি-সাধারণের ভাণ্ডার গৃহ বই আর কিছুই নহে তাহাকে নমস্কার কেন ? যদি সাধারণের ভাণ্ডারগৃহ নির্জ্জীব পৃথিবী নমস্কার পাইতে অধিকারী হইল, তবে আমার স্বকীয় ভাণ্ডারগৃহ, যাহার সমস্ত দ্রব্য সুধু আমারই সুখ সাধনে বিনিযুক্ত রহিয়াছে, যাহার প্রত্যেক বস্তুতে আমারই নাম চিহ্নিত রহিয়াছে, সেই একমাত্র আত্ম-সুখ-দ্রব্য-পরিপূরিত ভাণ্ডার গৃহ তাহাতে অনধিকারী রহিবে কেন ? শুষ্কহৃদয় অপ্রেমিক ব্যক্তি এইরূপ কূট তর্ক উত্থাপিত করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহার হৃদয় কোমল, কঠোরতা যাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখনও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। তিনি প্রেমের চক্ষে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সকলের দিকে চাহিয়া দেখেন। পুষ্প তাঁহার নিকট হাস্য করে ; বৃক্ষ তাহার অঙ্গে চামর ব্যজন করে, নির্ঝরিণী কুলু কুলু ধ্বনিতে তাঁহাকে প্রেমগীতি শিক্ষা দেয় ; পর্ব্বত তাঁহাকে আত্ম নির্ভরের গূঢ়মন্ত্র প্রদান করে; সমস্ত জগৎ তাঁহার সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হয়। তিনি অমনি ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে সকলের একমাত্র ধারয়িত্রী,

একমাত্র প্রসূতি বসুন্ধরাকে নমস্কার করেন; অমনি সর্ব্ব-প্রিয়-বিধাত্রী, সর্ব্বাভিলষিত-প্রদায়িনী পৃথিবীকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অভিবাদন করেন। বাস্তবিক, যে পৃথিবী নিয়ত সমস্ত জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা, পর্ব্বত স্রোতঃস্বতী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার বিশাল বক্ষে অনন্ত কোটী জীব অনবরত ক্রীড়া করিতেছে, যিনি অম্লান বদনে সকলের সকল ভার বহন করিতেছেন, সেই সর্ব্বপালয়িত্রী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীকে কখনও সামান্য নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া হৃদয় তৃপ্ত হইতে চায় না। আরও দেখ, যে হৃদয় প্রেম-চক্ষে বহির্জ্জগতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে, যে হৃদয় অসঙ্কুচিত ভাবে কহিতে পারে, "এই গন্ধগুণযুক্তা পৃথিবী, এই রস গুণোপেত জলরাশি এই স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল, ঐ প্রজ্বলিত তেজোরাশি এবং সশব্দ নভোমণ্ডল, সকলে আমায় এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন আমি অদ্যকার দিন মঙ্গলমতে যাপন করিতে পারি;" যে হৃদয় দৃঢ় নির্ভরেরভাবে কহিতে পারে—"সপ্ত মহার্ণব, সপ্তকুলাচল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সপ্তমহাদ্বীপ সংক্ষেপতঃ ভূরাদি সমস্ত ভুবন, আমায় এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন আমি মঙ্গল মতে অদ্যকার দিন যামিনী যাপন করিতে পারি (১)।" সেই হৃদয়ের কত সুখ! তাহার কত

---

(১) পৃথ্বী সগন্ধা সরসাস্তথাপঃ সস্পর্শ বায়ুর্জ্বলিতঞ্চ তেজঃ।
নভঃ সশব্দং মহতা সহৈব কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥
সপ্তার্ণবা সপ্তকুলাচলাশ্চ সপ্তর্ষয়ো দ্বীপবরাশ্চ সপ্ত।
ভূরাদি কৃত্বা ভুবনানি সপ্ত কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

বামন পুরাণ, ১৪ শ অধ্যায়

শান্তি। যিনি এইরূপ নির্ভরভাবাপন্ন সরল হৃদয়ের অধিকারী, তিনি কেমন অসঙ্কুচিত চিত্তে সকলের দিকেই চাহিতে পারেন। কেমন নিশ্চিন্ত মনে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্তই তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন আর্য্যগণ পৃথিবীকে নির্জ্জীব জানিয়াও তাহার প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এবং এই জন্যই তাঁহারা সংসার ক্ষেত্রে প্রথম-পাদ-বিক্ষেপ কালে পৃথিবীকে ভক্তি ভরে নমস্কার করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আর, তাঁহারা কি আমাদিগকে সংসারক্ষেত্রে প্রথম পাদবিক্ষেপ কালে শুধু নির্জ্জীব জগতের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই তৃপ্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন? যিনি জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিধাতা, সামান্য একটী পরমাণুও যাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে পার্শ্ব বর্জ্জন করিতে অক্ষম সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বরের পবিত্র প্রেম কি শুধু প্রকৃতির ভিতর দিয়া অনুভব করিতে বলিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছেন? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি আর তাঁহার জীবন্ত প্রেম উপলব্ধি করিয়া সম্মুখীন ভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং প্রেম বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃতার্থ হইতে উপদেশ প্রদান করিয়া যান নাই? না, পরমজ্ঞানী হিতচিকীর্ষু আর্য্য মনীষিগণের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তাঁহারা এক দিকে যেমন প্রকৃতির ভিতর দিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রেমভাব বিলি

খিত দেখিয়া সমস্ত জগৎকে প্রেমভাবে আলিঙ্গন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি— বরং ততোঽধিক—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পবিত্র পদারবিন্দে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তে এই বলিয়া তাঁহার পবিত্র আদেশ ভিক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে,—"হে লোকেশ চৈতন্যময় আদিদেবতা বিষ্ণো! আমি তোমারই আজ্ঞায় প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তোমারই প্রিয় কামনায় সংসার যাত্রার অনুবর্ত্তন করিব। ধর্ম্ম যে কি, তাহা আমি জানি, কিন্তু, তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্ম যে কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু, তাহাতেও আমার নিবৃত্তি নাই; হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদিস্থলে অবস্থিত থাকিয়া আমায় যে কার্য্যে নিযুক্ত কর, আমি তাহাতেই নিযুক্ত হই (১)"। এইরূপে বহির্জ্জগতে এবং অন্তর্জ্জগতে — পরোক্ষ ভাবে এবং সম্মুখীন রূপে— জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র প্রীতি উপলব্ধি করিয়া যাহাতে আমরা সমস্ত সংসারকে প্রেম ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু-জন-পরিবৃত সৌভাগ্যবান্ পুরুষের ন্যায়

---

(১) লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্য ধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

আনন্দিত মনঃপ্রাণে কর্ত্তব্য সংসাধনে নিযুক্ত হইতে পারি, এই উদ্দেশ্যে এই সাধূপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐরূপ পবিত্র বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদের হিত কামনার জ্বলন্ত পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর ভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াই নলরাজা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতির নাম স্মরণ পূর্ব্বক চক্ষুতে জলপ্রক্ষেপ দিবার বিধান (১)।

সকলেই অবগত আছেন সুদীর্ঘ নিদ্রার পরে চক্ষুদ্ব য় ঈষৎ রক্ত বর্ণ ধারণ করে। চক্ষুদ্ব য় এবং মস্তিষ্ক একই ধমনী সমষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত। নিদ্রা কালে যখন হৃৎপিণ্ড হইতে মস্তিষ্কাভিমুখে রক্ত-স্রোত ধাবিত হইয়া থাকে (২), তখন তাহার কিয়দংশ পথিমধ্যে চক্ষুদ্ব য়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই চক্ষুর ঐরূপ আরক্তিমতার প্রধান কারণ। আরও একটী কারণ আছে, নিদ্রা কালে কণীনিকাবরণী (কঞ্জেক্‌টাইবা) নামক ঝিল্লিবৎ পরদার উপর অক্ষি-পত্রের (আইলিড্‌) এর চাপ পড়ে, এই চাপ জন্যও চক্ষুতে রক্তাধিক্য হইতে পারে। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, নিদ্রাকালে যে চক্ষুতে রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই রক্তাধিক্য জন্যই চক্ষুদ্ব য় উষ্ণ হয় এবং

(১) এইরূপ নাম গ্রহণের কোন উপযোগিতা আছে কি না তাহা ৪৬—৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

(২) পাদ প্রক্ষালনাদির হেতু-নির্দ্ধারণ-স্থলে দ্রষ্টব্য।

নেত্রমল উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে কঞ্জেক্টিবাইটিস্ নামক প্রদাহ-বিশেষ জন্মিতে পারে। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যদি চক্ষুর্দ্বয়ে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ উষ্ণতা বিদূরিত হইয়া চক্ষু শীতল হয়, নেত্রমল বিধৌত হইয়া দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে এবং উক্তরূপ প্রদাহের আশঙ্কা বহু পরিমাণে তিরোহিত হইয়া যায়। অপর, শীতল জলের সঙ্কোচন ও সজীবীকরণ শক্তি অতিশয় প্রবল। নিদ্রাকালে অক্ষিপুটে রক্তাধিক্য নিবন্ধন যে উষ্ণতা জন্মে, তদ্দ্বারা দর্শন স্নায়ুর (অপ্‌টিক্ নার্ব্বের) পরিধি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার কিছু শিথিলতা জন্মিয়া থাকে। শীতল জল প্রক্ষেপে সেই পরিধি সঙ্কুচিত হওয়াতে উহার (দর্শন-স্নায়ুর) শিথিলতা বিদূরিত হয় এবং সজীবতা জন্মে সুতরাং দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকে (১)। বোধ হয় এই সমস্ত কারণেই নেত্র প্রক্ষালনের ব্যবস্থা নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মনিচয় মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছে (২)।

(১) আমি এক জন সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে রাত্রিকালে ছুঁচে সূতা লাগাইতে দেখিয়াছি। তিনি প্রত্যহ প্রাতে, স্নানের বেলায় ও সন্ধ্যা কালে চক্ষুতে শীতল জলের প্রক্ষেপ দিতেন। ৮০।৮২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার কাল পূর্ণ হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি শক্তি অনেক ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক যুবকাপেক্ষা প্রখর ছিল। কে বলিতে পারে যে ঐ জল প্রক্ষেপই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিবার প্রধান কারণ ছিল না?

(২) আহ্নিকাচার তত্ত্ব।

এবং চক্ষুতে জল না দিয়া ঘরের বাহির হইলে "দোষ" এই সংস্কার সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে।

মূত্র পুরীষোৎসর্গ

বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জীবন ধারণে ইচ্ছুক সে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মৈত্র-কর্ম্ম সমাচরণ করিবে, কদাপি মলাদির স্বাভাবিক বেগ ধারণ করিবে না (১)। এস্থলে "মৈত্রকর্ম্ম,, বলিতে মূত্র পুরীষোৎসর্গ বুঝাইতেছে। "মৈত্র,, অর্থ হিতকর। যে কার্য্য যথাকালে সমাচরিত হইলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহার নাম "মৈত্র,, অর্থাৎ হিতকর কর্ম্ম রাখা যুক্তিযুক্তই বটে। এই মৈত্রকর্ম্ম কিরূপ স্থানে নিষিদ্ধ ও কিরূপ স্থানে বিধেয় এবং তৎ-সময়ে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে পুরাণশাস্ত্র বলিতেছেন:—দেব, গো, ব্রাহ্মণ, বহ্নি ও রাজপথ এবং চতুষ্পথ এই সমস্ত স্থানে গমন করিবে না। গোষ্ঠে অর্থাৎ প্রান্তরে গমন করিবে এবং তৎকালে শীর্ষ,

(১) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীর চিন্তাং নির্বর্ত্ত্য মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
স্বভাবতঃ প্রবৃত্তানাং মলাদীনাং জিজীবিষুঃ।
ন বেগান্ধারয়েদ্ধীরঃ কামাদীনান্তু ধারয়েৎ॥

রাজবল্লভ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুখ ও নাসিকা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে (১) এবং সংযতবাক্ সম্বিতাঙ্গ এবং অবগুণ্ঠিত হইয়া বসিবে (২)। উক্ত নিষিদ্ধ স্থানগুলিতে যে কেন গমন করিবে না তাহা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির ও অধিগম্য। মলত্যাগ কালে মুখ ও নাসিকা আচ্ছাদিত রাখিবার তাৎপর্য্যও সহজবোধ্য। ঐ সময় মুখ ও নাসিকা উন্মুক্ত রাখিলে মলের দুর্গন্ধ ও দূষিত অণুসকল নিশ্বাস পথে শরীরস্থ হইয়া বিরক্তিকর এবং অপকারক হইয়া উঠে, এই জন্যই ঐরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত রাখিবার বিশেষ কোন হেতু পরিলক্ষিত হয় না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন প্রত্যূষেই মলাদি ত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রান্তরে যাইয়া তৎকার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তখন মস্তক অনাবৃত রাখিলে অতিরিক্ত শিশির সম্পাতে ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়ার কারণ জন্মিতে পারে, এই জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

অনন্তর প্রান্তরে গমন। প্রান্তরে গমনের উদ্দেশ্যই গৃহ হইতে দূরে মলাদি পরিত্যাগ করা। তবে স্থলবিশেষে এমনও হইতে পারে যে, যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ব্যবধানে যাইবার জন্য স্পষ্ট বিধান না থাকে, তবে

(১) ন দেব গোত্রাহ্মণ বহ্নিমার্গে ন রাজ মার্গে ন চতুষ্পথেচ।
কুর্য্যাদ্ যথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে প্রচ্ছাদ্য শীর্ষং মুখ নাসিকঞ্চ॥
বামণপুরাণ, ১৪শ অধ্যায়।

(২) নিয়ম্য প্রয়তোবাচং সম্বিতাঙ্গোঽবগুণ্ঠিতঃ।
আচার রত্নাকর ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

প্রান্তরে গমনেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত না হইতে পারে; কেননা, অনেক স্থলে অনেক বাড়ীর অনতি ব্যবধানেই প্রান্তর থাকে। এইজন্য প্রান্তরে গমনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াও শাস্ত্রকারগণ ব্যবধানের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা ব্যবধান সম্বন্ধে নিয়ম করিয়াছেন যে, ধনু নিক্ষিপ্ত তীর যতদূর যাইয়া পতিত হয় তাহার পরপারে কিংবা অন্যূন দেড় শত হস্ত ব্যবধানে মলত্যাগ করিবে (১)। মলাদি পরিত্যাগার্থ প্রান্তরে গমনকালে পাদুকা ব্যবহারের বিধান ছিল না; নগ্নপদে গমন করিতে হইত (২)। ইহার হেতু এই বোধ হয়, ঃ—প্রত্যূষ সময়ে নগ্নপদে গ্রামের প্রান্তে গমনাগমন করিলে দুর্ব্বা প্রভৃতির উপর যে সমস্ত শিশির রাত্রিতে সঞ্চিত হয় তাহা পদতলে সংলগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে পদতলের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে। এইরূপ করিতে প্রথমে অবশ্যই সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু, কিছু দীর্ঘকাল এইরূপ চলিতে থাকিলে শেষে শৈত্য বিলক্ষণ সহ্য হইয়া যায়। সহজে আর শৈত্য সংস্পর্শে কোনরূপ পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না; দিন দিন পদতল দৃঢ় এবং

(১) মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং।
হস্তানান্তু শতৈঃ সার্দ্ধং লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ॥
আচার রত্নাকর ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন।

(২) ন সোপানৎকো মূত্র পুরীষে কুর্য্যাৎ।
আচার রত্নাকর ধৃত আপস্তম্ব।

কর্ম্মঠ হইতে থাকে; কি শৈত্যে কি উত্তাপে কিছুতেই আর সহসা কোন অপকারের সম্ভাবনা থাকে না; এমন কি শীতকালীয় রাত্রির শিশির-সিক্ত দুর্ব্বাময় পথে কি গ্রীষ্মকালীয় দিবার উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে পাদুকা বিহীন অবস্থায় চলিতেও তাদৃশ পীড়ার বা ক্লেশের কারণ থাকে না। অস্মদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণগণ এবং কৃষক সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এইরূপ নির্দ্ধারণের যাথার্থ্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। ইঁহাদের মধ্যে প্রতি শতে একজনও পাদুকা লইয়া মলত্যাগার্থ গমন করেন না। প্রায় সকলেই প্রত্যূষে নগ্নপদে গ্রামপ্রান্তে মলত্যাগার্থ গমন করিয়া থাকেন. অথচ ইঁহাদের মধ্যে ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আর যাঁহারা সভা পাদুকা ব্যতীত মলত্যাগও যাঁহাদের নিকট অস অভ্যাস, তাঁহাদের মধ্যে ঐ রূপ পীড়া গ্রস্ত রোগীর সংখ্যা কত? তাঁহাদের ঐ রূপ শৈত্য-সহনে অনভ্যাসই সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শে পীড়া জন্মিবার মূলীভূত কারণ।

প্রান্তরে গমনের আরও উপকারিতা আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাতঃকালীয় বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর. তাহার সংস্পর্শে শরীর সজীবতা প্রাপ্ত হয়। এই বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবহণ সময়ে গৃহ হইতে দূরে উন্মুক্ত স্থানে যাতায়াতে প্রাতর্ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন-জনিত উপকার ও কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইতে পারে।

এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রান্তরে গমনের ব্যবস্থা পল্লীর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। জন-কোলাহল-পরিপূরিত নগরের জন্য কদাপি ঐ রূপ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতে পারে না। তথায় শৌচাগারে (পায়খানায়) গমন করা একান্ত আবশ্যক, এবং বাধ্য হইয়াই তদ্রূপ করিতে হয়। শৌচাগার যদি উত্তম রূপে পরিষ্কৃত থাকে, তবে তাহাতে দুর্গন্ধ জনিত অপকারের সম্ভাবনা থাকেনা সত্য, কিন্তু, প্রান্তরে গমনের সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে যে উল্লিখিত রূপ হিত সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

প্রান্তরে গমন সম্বন্ধেও আবার বিবেচনা আছে; সকল প্রান্তরে গমন প্রশস্ত নহে; গ্রামের নৈঋত কোণে ও দক্ষিণ দিকে যে প্রান্তর আছে, তাহাতে গমনই প্রশস্ত (১)। অন্যান্য দিকের কথা না বলিয়া ঐ দুই দিকের কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, এ দেশে যখন বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ঐ দুই দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় না, তখন ঐ দুই দিকে মলাদি পরিত্যক্ত হইলে, তাহার কণা সকল বায়ু-বাহিত হইয়া গ্রামের অধিবাসী গণের পীড়া জনক হইবার আশঙ্কা থাকে না। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা যে বায়ুকে সচরাচর "দক্ষিণে বায়ু" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিক ঠিক্ দক্ষিণ দিক্ হইতে

(১) আহ্নিকাচার তত্ত্ব।

প্রবাহিত হয় না, অগ্নি কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

অনন্তর শৌচ কর্ম্ম। শৌচ শব্দটী শুচি শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুচি শব্দের অর্থ—পবিত্র; সুতরাং শৌচ কর্ম্ম শব্দে পবিত্রতা জনক কর্ম্ম বুঝাইতেছে। আর্য্য শাস্ত্রে এই শৌচ শব্দ বহু ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ শৌচ কে "বাহ্য ও "আভ্যন্তর" দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাহ্য শৌচ পেক্ষা আভ্যন্তরীণ শৌচ যে শ্রেষ্ঠতর তাহা উপপন্ন করা হইয়াছে (১)। অনন্তর বাহ্য শৌচই বা কিরূপে সংসিদ্ধ হয়, আভ্যন্তরিক শৌচই বা কি ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে (২)। এস্থলে আমরা শৌচ শব্দের এই মহাব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিব না। সাধারণে যাহাকে শৌচ কর্ম্ম বলিয়া জানে, সুধু সেই অর্থেই শৌচ শব্দ প্রয়োগ করিব।

আর্য্যগণ সর্ব্ব বিধ শৌচ কর্ম্মের বিশেষতঃ মূত্রপুরী ষোৎসর্গের পরকর্ত্তব্য শৌচকর্ম্মের সম্বন্ধে বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী ভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে মল

(১) শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্য মাভ্যন্তর স্তথা।
অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরং॥
বামন পুরাণ, ১৪ অধ্যায়।

(২) শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তর স্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধি রথান্তরং॥
গরুড় পুরাণ, ২১৫ অধ্যায়। (শব্দ কল্পদ্রুম॥

মূত্রাদির কণামাত্র শরীরে সংলগ্ন হইয়া ঘৃণাজনক এবং অপকারক না হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা এই শৌচ কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপীয়েরা মল মূত্রাদি পরিত্যাগের পর যেরূপ পিশাচবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আর্য্যগণের পবিত্র মনে তদ্রূপ পৈশাচিক ভাব ভ্রম ক্রমেও স্থান পায় নাই। তাঁহারা মল মূত্রাদি পরিত্যাগের পর তত্তদ্দ্বারে প্রথমতঃ মৃৎপিণ্ড ঘর্ষণ করিয়া তৎপর জল শৌচের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন (১)।

আচার রত্নাকর বলেন ঃ— "গুহ্যদেশে লোষ্ট্র অর্থাৎ ঢিল ও কাষ্ঠ কিম্বা তৃণদ্বারা বিষ্ঠা ত্যাগ করতঃ তিনবার গুহ্যদেশে একবার লিঙ্গে মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জল শৌচ করিবে। তদনন্তর বাম হস্তের পৃষ্ঠ দেশে ছয় বার মৃত্তিকা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার দশবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। তদনন্তর উভয় হস্তে সাতবার তদনন্তর নখের মলা তৃণের দ্বারা শোধন পূর্ব্বক তিনবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া উভয় পাদে তিনবার ততো হস্ত পদাদি

(১) উদ্‌ধৃতাভিস্তো [illegible] ভ্যামিথং মারক যত্নতঃ।
গন্ধোৎসর্গং ত[illegible] কুর্য্যাৎ শৌচং মূত্র পুরীষয়োঃ॥

পাদ্মে ব্রহ্মখণ্ড, ১০ অধ্যায়
শব্দ কল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত।

প্রক্ষালন (১) ,,। বামণ পুরাণোক্ত ব্যবস্থাও প্রায় এইরূপ (২)।

মূত্র পুরীষোৎসর্গের পরে যদি মলদ্বারে মৃৎপিণ্ড বা তৃণাদি সংস্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে তদীয় দূষিত কণা সকল বহু পরিমাণে ঐ পিণ্ডে বা তৃণাদিতে সংলগ্ন হওয়া মলদ্বার অনেক পরিষ্কৃত হয়, অনন্তর জল শৌচ করিলে কোনরূপ অপরিষ্কার কি অপরিচ্ছন্নতার আশঙ্কা থাকে না। শৌচার্থে বল্মীক মৃত্তিকা, মূষিকোৎখাত মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতি কয়েক প্রকার

"(১) অথবাবাক্ বিণ্মুত্রং লোষ্ট্র কাষ্ঠ তৃণাদিনা।

ভরদ্বাজঃ।

(ক) একা লিঙ্গে গুদে তিস্র স্তথাবামকরে দশঃ।

উভয়ঃ সপ্তদাতব্যামৃদঃ শুদ্ধি মভীপ্সিতা॥

মনুদক্ষৌ।

(খ) দশমধ্যেতু ষট্ পৃষ্ঠে

হারীতঃ।

(গ) তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়া কৃত্বাতু নখশোধনং।

তিস্রস্তু পাদয়ো দেয়া শুদ্ধিকামৈন নিত্যশঃ॥

শঙ্খ দক্ষৌ।

(২) ততশ্চ শৌচার্থ মুপাহরেন্মৃদং গুদে ত্রয়ং পাণি তলেচ সপ্ত

তথোভয়োঃ পঞ্চ চতুস্তথৈকাং লিঙ্গে তথৈকাং মৃদমাহরেচ্চ।

চতুর্দ্দশাধ্যায়।

আচার রত্নাকর হইতে উদ্ধৃত।

মৃত্তিকা নিষিদ্ধ (১)। যাহা হউক, শৌচার্থে যেরূপ মৃত্তিকাই ব্যবস্থিত হইয়া থাকুক, মৃত্তিকা শৌচের যে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এই যে তৃণ মৃত্তিকাদি দ্বারা একরূপ এবং জল-দ্বারা একরূপ এই দুইরূপ শৌচকর্ম্ম, আর্য্যগণ ইহাকেও প্রচুর মনে করেন নাই; ইহার পরেও আবার স্নানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। আহ্নিকাচারতত্ত্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শৌচ কর্ম্মের পরেই প্রাতঃস্নান বিধিবদ্ধ হয় নাই সত্য, কিন্তু, মুখ প্রক্ষালনাদি যে যে কার্য্য সমাধান্তে উক্তরূপ স্নানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত কার্য্য শৌচ কর্ম্মের অব্যবহিত পরেই কর্ত্তব্য; সুতরাং শৌচ কর্ম্মের ও প্রাতঃ স্নানের মধ্যে কাল-ব্যবধান নিতান্তই অল্প। বামণ পুরাণেও ঐরূপ অল্প ব্যবধানে স্নানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; কিন্তু, সে পূর্ণ-স্নান নহে, শিরঃস্নান মাত্র। যাহা হউক, শৌচ কর্ম্ম সম্বন্ধে আর্য্যগণের যে এইরূপ বিবিধ বিধান পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মূল তাৎপর্য্য কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এইরূপ পরিষ্কার পরি

(১) বল্মীক মূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলস্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপ সম্ভবাং॥
আচাররত্নাকর ধৃত বিষ্ণুপুরাণ বচন।

(ক) নান্তর্জ্জলাদ্রাক্ষস মূষিক স্থলান্ চাবশিষ্টা সদনাদি ভগ্না।
বল্মীক মৃচ্চৈবহি শৌচনায় গ্রাহ্যা সদাচার বিদা নরেণ॥
বামণপুরাণ, ১৪শ অধ্যায়।

চ্ছন্নতার ফল সুধু স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কার্য্যকর হইয়াই পর্য্য বসিত হয় না, অন্তঃকরণেও উহার কার্য্যকারিতা প্রকাশিত হয়। যদি দৈবাৎ কখনও কোন কারণে শৌচকর্ম্ম তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত সম্পন্ন না হইতেপারে, তাহা হইলে শরীর নিতান্তই অপবিত্র বোধ হইতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তি হীন এবং সঙ্কোচ ভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করে। যদিও এইরূপ ভাব প্রধানতঃ অভ্যাসেরই ফল, তথাপি উহা অপ্রাকৃতিক বলা যাইতে পাবে না, কেননা প্রকৃতি চির কালই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতিনী। যাঁহারা ঐরূপ অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকাকে অপবিত্রতা-জনক বলিয়া মনে না করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক প্রকৃতির বিপরীত ভাবাপন্ন, অভ্যাস দোষ তাঁহাদিগকেই অপবিত্রতাকে অপবিত্রতা বলিয়া ঘৃণা করিতে দেয় না। আমরা ইদানীন্তন নব্যসম্প্রদায়ীগণের মধ্যে এইরূপ বিকৃতভাব প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহারা দিন দিন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের যে রূপ তীব্র শৌচ জ্ঞান ছিল তাহা হইতে নিতান্তই ভ্রষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা মৃত্তিকা শৌচের তো নাম গন্ধও জানেন না, জল শৌচ সম্বন্ধেও নিতান্ত সংক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন। আশঙ্কা হয়, কবে যেন শুনিতে পাই, ইউরোপীয় গুরুদেব দিগের অনুকরণে তাঁহারা জলকে বিদায় দিয়া কাগজ দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই আশঙ্কা কল্পনা-প্রসূত সন্দেহ নাই, কিন্তু, ইহার ভাবী লক্ষণ একেবারে নাই এমত বলিতে পারি না; ইতি মধ্যেই অনেকে মূত্র ত্যাগের পর-কর্ত্তব্য জলশৌচকে বৃথাড়ম্বর এবং কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!! অথচ এই মূত্র শৌচ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মূত্র-দ্বারে এবং উভয় হস্তে মৃত্তিকা গ্রহণ পর্য্যন্তও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন (১)।

শৌচকর্ম্ম সম্বন্ধে যে যে নিয়ম উল্লিখিত হইল তৎ সমস্ত পূর্ণ শৌচ কারী সম্বন্ধে। পাত্রভেদে উহার অনেক লাঘব হইতে পারে। এই পাত্রভেদ সম্বন্ধে উক্ত আছে ঃ— দ্বিজগণ যে পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকেন অর্থাৎ যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে এবং শূদ্র ও স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে প্রাগুক্ত রূপ পূর্ণ শৌচের পরিবর্ত্তে গন্ধ-লেপ-ক্ষয়-কর শৌচ অর্থাৎ যে পরিমিত মৃজ্জলাদি গ্রহণে মলাদি এবং তাহার গন্ধ বিদূরিত হয়, মাত্র সেই পরিমিত শৌচ ব্যবস্থিত হইয়াছে (২)। অপর, সময় এবং শৌচ কারীর অবস্থাভেদেও শৌচের পরিমাণ সম্বন্ধে ইতর বিশেষ

(১) একা লিঙ্গে মৃদং দত্ত্বা বাম হস্তেতু মৃত্ত্রয়ং।
উভয় হস্তয়োর্দ্বেতু মূত্র শৌচং প্রকীর্ত্তিতং।
স্মৃতি।

(২) ন যাবদুপনীয়ন্তে দ্বিজাঃ শূদ্রাস্তথাঙ্গনাঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে॥
স্মৃতি।

কথা হইয়াছে যথা :— দিবাভাগে যে পরিমাণ শৌচের (পূর্ণ শৌচের) ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধেক কর্ত্তব্য। আতুর ব্যক্তি তাহার (রাত্রির) অর্দ্ধেক অর্থাৎ চতুর্থাংশ বা পাদমাত্র এবং পথিক ব্যক্তি আবার তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক অষ্টমাংশ বা অর্দ্ধ পাদ মাত্র শৌচ করিলেই চলিবে (১)। এইরূপ সময় এবং পাত্র ও অবস্থা ভেদে শৌচ বিধানের ঈদৃশ তারতম্য কেন করা হইয়াছে তাহা দুর্ব্বোধ্য নহে।

পদ প্রক্ষালন।

শৌচকর্ম্ম সমাধান্তে পদ প্রক্ষালনের বিধান (২)। মনুষ্য শরীরের একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, উহার যে অঙ্গ যে পরিমাণে পরিচালিত হয়, সেই অঙ্গে সেই পরিমাণে রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে অঙ্গের চালনা অল্প হয়, তথায় রক্তের মাত্রা অল্পতর থাকে এবং যে অঙ্গের চালনা অধিক হয় তথায় রক্তের মাত্রা অধিক তর হইয়া থাকে। এই নিয়ম সুধু হস্ত পদাদি বহিরঙ্গ

---

(১) যথোদিতং দিবাশৌচ মর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে ;
আতুরস্য তদর্দ্ধংস্যাৎ তদর্দ্ধং পথিকঃ স্মৃতঃ ॥
আচার রত্নাকর ধৃত দক্ষ বচন।

(২) শৌচ কর্ম্মান্তে যে পাদ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা, তৎপূর্ব্বে কাহারও কাহারও মতে মৃত্তিকাদ্বারা পদমার্জ্জনাও কর্ত্তব্য। (৬৯ পৃঃ র টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধেই কার্য্যকর নহে, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধেও ইহা তুল্যরূপে কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ, কি বহিরঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, কি আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রভৃতি, যাহারই কেন চালনা অধিক না হউক, তাহাতেই রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে। এদিকে শরীরের বিধানও আবার এমন যে, কোনও সময়ে সমস্ত শরীর একেবারে ক্রিয়াশূন্য হইতে পারে না, একাঙ্গের না একাঙ্গের ক্রিয়া হইবেই হইবে। বাস্তবিক, সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-হীনতা আর মৃত্যু একই। এই ক্রিয়াশীলতা সুষুপ্তি সময়ে পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, তখন যদিও হস্ত পদাদি বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মৃতবৎ নিস্পন্দ থাকে। তথাপি মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতির ক্রিয়া অব্যাহত রূপে চলে। জাগ্রদবস্থায়ও ইহাদের ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই সত্য, কিন্তু, তৎকালে বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরও ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং তজ্জন্য রক্তস্রোত উভয় দিকেই বহিতে থাকে; নিদ্রাকালে যখন বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া একরূপ বন্ধ থাকে, তখন রক্তস্রোত কাজেই অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রনিচয়ের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং হস্ত পদাদি অপেক্ষাকৃত শিথিল ও দুর্ব্বল ভাবাপন্ন হয়। এই নিমিত্ত সুদীর্ঘ নিদ্রার পরে গাত্রোত্থান করিলে শরীর সাধারণতঃ কিছু দুর্ব্বল বোধ হয়। যাহা হউক, নিদ্রাকালে এই যে আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহের কার্য্যকারিতা চলিতে থাকে বলা হইল, ইহাও সকল যন্ত্রে

তুল্যরূপে নহে; প্রয়োজনমতে কোন যন্ত্রের কার্য্য ন্যূনাধিক কোন যন্ত্রের কার্য্য বা অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে থাকে। অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা অধিকতর; কেননা অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহার একমাত্র জড়ভাবাপন্ন কার্য্য নহে; অর্থাৎ ইহার কার্য্য শুধু শারীর কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় না, ইহা মনের আধার বিধায় (১) অতীন্দ্রিয় কার্য্যও ইহার বিষয়ীভূত। মস্তিষ্কের এই দ্বিবিধ কার্য্যশীলতা নিবন্ধন অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা স্বভাবতঃই ইহারদিকে রক্তস্রোত কিছু অধিকতর মাত্রায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেক সময় যখন অন্য কোন ও যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইয়া অপকার না জন্মায়, তখন ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। এই রক্তাধিক্যের ফল শিরঃপীড়া। এই নিমিত্ত অনেক সময়েই আমাদের শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মিয়া এই যে শিরঃপীড়ার উদ্ভব হয়, ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক পাদপ্রক্ষালন। পাদ প্রক্ষালন কালে পদদ্বয় ঘর্ষিত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে রক্তস্রোত তদভিমুখে (পাদাভিমুখে) ধাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিপরীত দিক্ অর্থাৎ

---

(১) মনের গোলক (অধিষ্ঠান স্থান) লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন উহার স্থান ভ্রূযুগ-মধ্যে, কেহ বলেন উহার স্থান নাভী-পদ্মে, কেহ বলেন উহার অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্ক। এই শেষোক্ত মতই অধিকাংশের অনুমোদিত এবং অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণও এই মতের পোষকতা করেন।

মস্তকের দিকে যে রক্তস্রোত ধাবিত হইয়াছিল তাহা নিম্নাভিমুখী হয়, সুতরাং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া যে শিরঃপীড়ার আশঙ্কা ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদি পাদদ্বয় ঘর্ষণ দ্বারাই মস্তিষ্ক-সঞ্চিত বা তদভিমুখ-ধাবিত রক্ত রাশিকে নিম্নাভিমুখী করা সম্ভবপর হয়, তবে শুধু ঘর্ষণ করিলেইতো চলিতে পারে, অনর্থক শীতল জল ব্যবহারের অসুবিধা সহ্য করিয়া ফল কি? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পদঘর্ষণ দ্বারা রক্ত স্রোত কে নিম্নাভিমুখী করা যায় বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে যোগে শীতল জল ব্যবহৃত হইলে আরও অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। শীতল জলের যে শৈথিল্য-বারিণী (Astringent) শক্তি আছে, তদ্দ্বারা শিথিল ভাবাপন্ন অঙ্গ গুলির শিথিলতা বিদূরিত হইয়া বল-বিধান হয়। অপর, পদসংলগ্ন মলাদিও সহজেই বিদূরিত হইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জনিত উপকার নিচয় সংসাধিত হইতে পারে। এই সমস্ত কারণেই পাদপ্রক্ষালন কে একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পাদপ্রক্ষালন সুধু শৌচ কর্ম্মের পরেই কর্ত্তব্য নয়, আরও বহুসময়ে ইহা কর্ত্তব্য। তবে মল মূত্রাদি পরিত্যাগের পরে ইহার কর্ত্তব্যতা যত দূর দৃঢ়তর রূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অন্য কোন সময়ের

করিয়াছেন। তাঁহারা মুজা জুতা না চড়াইয়া বাহ্যে যাইবেন না, গরমের দিনে না হয় মুজাটা ছাড়িবেন, কিন্তু জুতা খরম ছাড়িয়া বাহ্যে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে ঘোর অসভ্যতা হইয়া উঠিতেছে। পায় জল দেওয়ার তো কথাই নাই, সেতো ঘোর কুসংস্কার (১)। এইরূপ করিয়া যে তাঁহারা দিন দিন ননীর পুতুল হইতেছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

আমার একজন ভ্রাতৃতুল্য স্নেহাস্পদ ব্যক্তি বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় অবস্থান কালে একদিন বাসার পায়খানায় গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেই বাসারই কতকটী আসল নব্য বাবু তাঁহাকে কুসংস্কারাবিষ্ট মনে করিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন :—"মহাশয়, আপনি এ আবার করেন কি? খালিপায়ে বাহ্যে যান, পা ধোন, ঝাড়ি মাজেন এসমস্ত কুসংস্কার কেন?" ছাত্রটী নিতান্ত বিনীত ও সচ্চরিত্র, তাই বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া এইমাত্র বলিলেন :— "পা ধুইলে শরীর কিছু ভাল বোধ হয়, তাই ধুইয়া থাকি।" সৌভাগ্য, ক্রমে এই ছাত্রটী বিদ্যা বুদ্ধি ও কৃতকার্য্যতাদি সম্বন্ধে অধিকাংশেরই শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তাই বড় বেশি হাস বিদ্রূপের হাতে পড়েন নাই, নচেৎ এই অপরাধে তাঁকে কত যে হাসি ঠাট্টা, নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হইত তাহার ইয়ত্তা কি?

জন্য ততদূর নহে (১)। মল মূত্র পরিত্যাগের সময় তাহার দূষিত কণা সকল শরীর সংলগ্ন হইয়া ঘৃণা ও অপবিত্রতা জনক এবং অপকারক হইবার সম্ভব। পাদ ধৌত করিলে সেই আশঙ্কা তিরোহিত হয়। অপর, কার্য্য কর্ম্মের সময় পাদ ধৌত করণার্থ বাহিরে আসিতে হইলে অনর্থক সময় নষ্ট এবং আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, মল মূত্র পরিত্যাগার্থে যখন বাধ্য হইয়াই বাহিরে আসিতে হইবে, তখন ঐ সময়ে পাদ ধৌত করিলে পৃথক্ কোনরূপ মনঃসংযোগের বা প্রারব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাতের কারণ থাকে না। অথচ তৎসঙ্গে সঙ্গে পাদ প্রক্ষালন জনিত গুরুতর অভীষ্ট সিদ্ধির ও বিলক্ষণ সুবিধা হয়। স্থূলকথা, যদিও প্রাগুক্তরূপ সময়ের জন্যই পাদপ্রক্ষালন দৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি অন্য অন্য বহুসময়েও যে পাদপ্রক্ষালন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ পাদপ্রক্ষালন করাকে শুদ্ধ, পবিত্র, আয়ুর্দ্ধিকর এবং অলক্ষ্মী ও কলিনাশক বলিয়া গিয়াছেন (২)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য বহু মঙ্গলপ্রদ প্রথার ন্যায় নব্য বাবুদের অনেকে এই পাদপ্রক্ষালন বিধিটীকেও কুসংস্কার বিশেষ বলিয়া উপেক্ষা করিতে আরম্ভ

(১) কোন নৈমিত্তিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান কালে বা সন্ধ্যাবন্দনাদির কালে যে পাদপ্রক্ষালন বাধ্যকর, এস্থলে তাহা অস্বীকার করা হইতেছে না।

(২) মেধ্যং পবিত্র মায়ুষ্য মলক্ষী কলিনাশনং।
পাদয়োর্ম্মলমার্গানাং শৌচাধান মভীক্ষ্ণশঃ॥

মুখপ্রক্ষালন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পরে যে মুখপ্রক্ষালনের রীতি দৃষ্ট হয়, তাহা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ও সমস্ত সমাজেই প্রচলিত আছে। অতএব উক্ত প্রথাটি যে নিতান্ত উপকারী তাহা হেতু প্রদর্শন ব্যতীত ও দৃঢ় রূপে বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, নিদ্রাকালে মুখা-ভ্যন্তরে যে সমস্ত ক্লেদ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা ধৌত না করা দূরে থাকুক, ধৌত করিতে কিছু বিলম্ব হইলেও মহা ক্লেশকর এবং ঘৃণাজনক বোধ হয়। শুধু ইহাই নহে, উত্তম রূপে মুখধৌত না করিলে দন্ত-মূল, দন্তমূল-সংলগ্ন মাংস (Gum.) প্রভৃতির শিথিলতা জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে নানাবিধ পীড়ার সূত্রপাত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আর্য্য শাস্ত্রকারগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের ন্যায় ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা দ্বারাও উহার অবশ্য প্রতিপাল্যতা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কহি-য়াছেন;—যাহার মুখ পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি সে অপ-বিত্র হয়; অতএব যত্ন পূর্ব্বক দন্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা দন্তধাবন পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালন করিবে (১)। কিরূপ বৃক্ষের দন্ত কাষ্ঠ

---

(১) মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্ত ধাবনং॥
বৃদ্ধ শাতাতপ।

ব্যবহার করিবে তাহার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে নানা বিধ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসমস্তের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বৃক্ষের রস তিক্ত ও কষায় গুণ বিশিষ্ট এবং কিছু কোমল, তৎসমস্তের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে (১)। সাধারণতঃ, তিক্ত ও কষায় গুণ বিশিষ্ট বস্তু সমূহের সঙ্কোচন গুণ আছে, সুতরাং দন্ত কাষ্ঠ ভক্ষণ কালে তাহার তিক্ত বা কষায় গুণ বিশিষ্ট অণু সকল দন্তমূলস্থ কোমল চর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নিদ্রাকালীয় শিথিলতা দূরীকরণ পুরঃসর তাহাকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করে সুতরাং দন্তমূল দৃঢ়সম্বদ্ধ থাকে। অপিচ, দন্তমূলে নানা প্রকারে যে সমস্ত দন্তমল সঞ্চিত হইয়া তাহার পীড়া জন্মাইবার কারণ হয়, দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহারে তাহাও তিরোহিত হয়। কিরূপ দন্তকাষ্ঠ নিষিদ্ধ তাহা নির্দ্ধারণ স্থলে উক্ত হইয়াছে ঃ—তৃণ-রাজ অর্থাৎ নারিকেল তাল প্রভৃতি সমস্ত বৃক্ষের শিরা পত্র প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করিবেনা, তাহা করিলে গোদর্শন রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুচি হইতে হইবে, অন্যথা দন্তধাবনকারী ব্যক্তি—তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি

(১) তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং
ক্ষীরিণো বৃক্ষগুল্মাদ্যা ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥
আচার রত্নাকর ধৃত স্মৃতিবচন।

যে বর্ণেরই কেন না হউন্ তাঁহার চণ্ডালত্ব জন্মিবে (১)। বোধ হয় এই সমস্ত বৃক্ষ অতি কঠিন বিধায় ইহাদের শিরা ও পত্রদ্বারা দন্তধাবনে দন্তমাংস বিদারিত হইয়া রক্তপাত হইবার আশঙ্কা আছে জন্য ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। এই নিষিদ্ধ কাষ্ঠাদির ন্যায় নখদ্বারা দন্তধাবন ও মহাপাতক জনক এমন কি গোমাংস ভক্ষণ তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। বোধ হয়, নখাগ্রে যে অনুগ্র একরূপ বিষাক্ত পদার্থ আছে, দন্তমূলে তাহা প্রবিষ্ট হইলে কোনরূপ গুরুতর পীড়া জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কায়ই ঐরূপ বিধান করা হইয়াছে। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার সম্বন্ধে তিথ্যাদির বিবেচনা করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অমাবস্যা প্রতিপদাদি যে সকল তিথিতে সাধারণতঃ রস বৃদ্ধি পায় সেই সমস্ত তিথিতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারে অপকারের সম্ভাবনা আছে জন্য তাহা ব্যবহারে নিষেধ করা হইয়াছে। স্বধু সামান্যাকারে নিষেধ করা হয় নাই।

---

(১) গুবাক তাল হিন্তালা স্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জ্জুর নারিকেলৌচ সপ্তৈতে তৃণ রাজকাঃ॥
তৃণরাজ শিরা পত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনং।
তাবদ্ভবতি চাণ্ডালো যাবদগাং নৈব পশ্যতি॥
আচার রত্নাকর ধৃত ক্রিয়া কৌমুদী।

(২) অঙ্গুল্যা দন্ত কাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষং লবনন্তথা।
মৃত্তিকা ভক্ষণঞ্চৈব তুল্যং গোমাংস ভক্ষণং॥
অত্রিসংহিতা।

ঐ সমস্ত তিথিতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারে কুলক্ষয়ের ভয় প্রদর্শন পর্য্যন্ত করা হইয়াছে (১) এবং ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ তিথিতে ও যে স্থলে দন্তকাষ্ঠের অভাব হয় তৎস্থলে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে (২) তথাপি দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই।

দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের পর জিহ্বা পরিমার্জ্জন। জিহ্বা পরিমার্জ্জনে উহার ক্লেদ বিদূরিত হইয়া মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে এবং ভোজন কালে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণের সুবিধা হয়। অপিতু, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকার্থ যে লালার প্রয়োজন, জিহ্বা উত্তম রূপে পরিমার্জ্জিত হইলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে পারে। অপর, ক্লেদ সঞ্চিত হইতে হইতে যে জিহ্বার জড়তা জন্মিয়া উচ্চারণ শক্তির ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা থাকে তাহাও বিদূরিত হয়। এই সমস্ত কারণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জিহ্বা পরিমার্জ্জনার্থ নির্লেখন অর্থাৎ চাছ্নি ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই নির্লেখন রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র বা লৌহ নির্ম্মিত এবং মৃদু অর্থাৎ নমনশীল, সুক্ষ্ম অর্থাৎ পাত্লা

(১) প্রতিপদ্দর্শ ষষ্ঠীষু মধ্যাহ্ণেব সপ্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠ সংযোগো দহত্যা সপ্তমং কুলং॥
আচার রত্নাকর ধৃত নৃসিংহ পুরাণ।

(২) অলাভে দন্ত কাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধ দিনে তথা।
অপাং দ্বাদশ গণ্ডূষৈর্মুখ শুদ্ধির্বিধীয়তে॥
আচার রত্নাকর ধৃত নারসিংহ পুরাণ।

এবং দশাঙ্গুল পরিমিত হইলেই ভাল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা ব্যবহারে মুখের বিরসতা এবং জিহ্বা ও দন্তের ক্লেদ দূর হয়, শরীর সুস্থ বোধ হয়, আহারে রুচি জন্মে এবং দন্তের দোষ অর্থাৎ পীড়ার সম্ভাবনা বিদূরিত হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে (১)। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই যে তাহার জিহ্বা পরিমার্জ্জনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় (২), তাহার মূলেও এই সমস্ত হেতুই বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই।

প্রাতঃ স্নান।

আর্য্যগণ স্নানকে একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম রূপে ব্যবস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্নান ব্যতীত শরীর পবিত্র হয় না। যিনি অস্নাত, তাঁহার আহারে, পানে; দেব পূজনে, সন্ধ্যাবন্দনে; রন্ধনে, বিগ্রহস্পর্শনে; কিছুতেই অধিকার নাই। স্নান-শক্ত ব্যক্তি যে অবস্থাপন্নই কেন না হউন, তাঁহাকে স্নান দ্বারা শুচি হইতে হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ "স্নান

(১) জিহ্বা নির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণ-তাম্র মায়সং।
তন্মলাপহরং শস্তং মৃদু শ্লক্ষ্ণং দশাঙ্গুলং॥
নিহন্তি বক্ত্র বৈরস্যং জিহ্বা দন্তাশ্রিতং মলং।
আরোগ্যং রুচিমাধত্তে সদ্যোদন্ত বিশোধনং॥
রাজবল্লভ।

(২) "জাত কর্ম্ম,, সমালোচন-স্থলে বর্ণিতব্য।

ব্যতিরেকে কর্ম্মজন্য জ্ঞান প্রশস্ত হয় না, অতএব সর্ব্ব কার্য্যে, বিশেষতঃ হোম এবং জপাদির অনুষ্ঠান-কালে স্নান করা একান্ত, কর্ত্তব্য (১)। আরও বলিয়াছেন :—স্নান ব্যতীত নির্ম্মলতা এবং ভাব শুদ্ধি জন্মে না, অতএব উদ্ধৃত জলেই হউক বা অনুদ্ধৃত জলেই হউক, (তোলা জলেই হউক বা নদ্যাদিতেই হউক) স্নান করিবেই করিবে (২)। এইরূপে স্নানের অবশ্য করণীয়তা বিধিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা নিম্ন লিখিত রূপে তাহার প্রকার-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ স্নান ত্রিবিধ :— নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য (৩)। নিত্যস্নান বলিতে প্রতিষেধক কারণ ব্যতীত যে স্নান প্রত্যহেই অবশ্য কর্ত্তব্য সেই স্নান বুঝায়। নৈমিত্তিক স্নান বলিতে যে স্নান নিমিত্ত বিশেষে সমাচরিত হয় অর্থাৎ গ্রহণ, সংক্রান্তি বা তাদৃশ অন্য কোন নিমিত্ত বিশেষের জন্য সমাচরিত হয়, সেই স্নান

নচ স্নানং বিনা পুংসাং প্রশস্তং কর্ম্ম-সংস্মৃতং।
হোমেজপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥
গরুড়পুরাণ, ৫০শ অধ্যায়।

২ নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
অনুদ্ধৃতৈ রুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ॥
পদ্মপুরাণ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নান মিষ্যতে।
তর্পণন্ত ভবে তস্য প্যঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥
ব্রহ্মপুরাণ।

বুঝায় ; এবং কাম্য স্নান বলিতে যে স্নান স্বর্গাদি কামনা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্নান বুঝায়। উক্ত রূপ বিভাগ দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, নিত্য স্নানেরই মাত্র নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবার সম্ভাবনা; অপর দ্বিবিধ স্নানের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, যে নিমিত্ত-বিশেষের জন্য স্নান করিতে হইবে, সেই নিমিত্ত-বিশেষ দিবসের কোন্ সময়ে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই ; তাহা দিবভাগে বা রাত্রি ভাগ কিংবা দিবা রাত্রির সন্ধিভাগদ্বয়ে, সংক্ষেপতঃ সর্ব্ব সময়েই উপস্থিত হইতে পারে। কাম্য স্নান সম্বন্ধেও এই কথা (১)। অপর, এই যে ত্রিবিধ স্নান, ইহাতেও স্নানের প্রকার-ভেদ শেষ হইল না; ইহারও আবার প্রকার ভেদ আছে। যদি ইহার প্রকার ভেদ না থাকিয়া মাত্র একরূপ স্নানই ব্যবস্থিত হয়, তাহা হইলে সময় ও অবস্থা বিশেষে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষেও তদ্রূপ স্নান করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত প্রাগুক্তরূপে বিভাগের পরেও আবার প্রকারভেদের আবশ্যকতা জন্মিয়াছে, যেন অশক্ত ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ না একরূপ স্নান দ্বারা শুচি হইতে পারেন। সেই প্রকারভেদ দ্বারা ও স্নান পঞ্চ প্রকার, ষড় ও সপ্ত বা সপ্ত প্রকার। মহর্ষি

---

(১) নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে ॥

পরাশর বলেন স্নান পঞ্চবিধ ঃ—আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য এবং দিব্য (১)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত পঞ্চবিধ স্নান ব্যতীত আরও দুই প্রকার স্নানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন ঃ—মন্ত্রস্নান এবং ভৌমস্নান (২)। যাহা হউক, এই যে সপ্ত বা পঞ্চবিধ স্নান, ইহার মধ্যে বারুণ স্নানই প্রধানতম। আমরা সচরাচর নদ্যাদিতে অবগাহন বা মস্তকে জলধারা সিঞ্চন করিয়া যে স্নান করিয়া থাকি সেই স্নানই বারুণ স্নান, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে এই স্নানই প্রশস্ত। কেন প্রশস্ত তাহার কারণ সহজবোধ্য। অনন্তর দিব্যস্নান। শব্দার্থ দ্বারাই অনুমিত হইতে পারে এই স্নানে অবগাহন বা জলধারা সিঞ্চনের প্রয়োজন করে না। দিব্ অর্থাৎ আকাশ হইতে বৃষ্টি বা হিমরূপে যে জলরাশি নিপতিত হয় তাহাতে স্নানের নামই দিব্য স্নান। তারপর আগ্নেয় স্নান। এই স্নানে জলের নাম গন্ধও নাই, শরীরে কিছু ভস্ম পরিমার্জ্জন করিলেই হইল। এই স্নান সন্ন্যাসাশ্রমের জন্যই প্রশস্ত। অনন্তর বায়ব্য স্নান, এই স্নানে গোধূলিস্পর্শ বা ধূলিদ্বারা অঙ্গ ম্রক্ষিত করিতে হয়। তারপর ভৌমস্নান; এই

(১) স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেবচ॥
পরাশর সংহিতা, ১২।৯।

(২) মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ॥
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

স্নানে মৃত্তিকা লেপন বা তিলক ধারণ করিতে হয় (১)। অনন্তর, ব্রাহ্মস্নান;—এই স্নানে "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মনে মনে "স্নাতোঽস্মি" অর্থাৎ আমি স্নাত হইলাম এইরূপ জ্ঞান করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মন্ত্র স্নানের সহিত ইহার কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং তদুক্ত মানসিক স্নানের সহিতও বোধহয় ইহার কোন ভিন্নতা নাই। বাস্তবিক, মহর্ষি পরাশর যাহাকে ব্রাহ্মস্নান বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকেই মন্ত্র এবং মানস এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, যাহাতে সর্ব্বাবস্থাতেই স্নান সম্ভবপর হইতে পারে, অর্থাৎ কেহ একরূপ স্নান করিতে অসমর্থ হইলে যাহাতে অন্যরূপ স্নান দ্বারা শুচি হইতে পারেন তজ্জন্যই যে উক্তরূপ বিভিন্ন প্রকার স্নানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ বিশেষে আর এক প্রকার স্নানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যাহা প্রাগুক্ত সপ্ত বা পঞ্চবিধ স্নানের মধ্যে গণিত হয় নাই। উহা "আশিরস্ক স্নান" নামে কথিত হইয়াছে। এই স্নানে মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ ধৌত করিতে কিংবা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয় (২)। বোধ

(১) তিলক ধারণের উপযোগিতা যথাস্থানে সমালোচিত হইবে।

(২) আশিরস্কং ভবেৎস্নানং স্নানাশক্তৌতু দেহিনাং।
আর্দ্রেণ বাসসাবাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥
আচার রত্নাকর ধৃত দক্ষ বচন।

(ক) অশক্তাবশিরস্কং বা স্নান মস্য বিধীয়তে।
আর্দ্রেণ বাসসা চাথ মার্জ্জনং কায়িকং স্মৃতং॥
কূর্ম্ম পুরাণ, উপবিভাগ, ১৭শ অধ্যায়।

হয়, এই স্নান প্রকৃত প্রস্তাবে বারুণ স্নানেরই অঙ্গ-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে বিবেচনায় ইহাকে প্রাগুক্ত স্নান-সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

উপরে যে সমস্ত স্নানের নামোল্লিখিত হইল, তাহার সকলই প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে সমাচরিত হইতে পারে। স্থল বিশেষে যে সায়ং সময়েও স্নানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা গৃহিদিগের জন্য নহে, সংসার ত্যাগী তপস্বিদিগের জন্য। গৃহিদিগের জন্য প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই দ্বিবিধ স্নানই ব্যবস্থিত হইয়াছে (১) তবে মাধ্যাহ্নিক স্নানাপেক্ষা প্রাতঃ স্নানের মাহাত্ম্য অনেকটা অধিক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন এইমাত্র প্রভেদ। তাঁহারা কেন যে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নানের কিরূপ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই দেখা আবশ্যক।

প্রাতঃস্নানের মাহাত্ম্য বর্ণন স্থলে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন:— অজ্ঞাতসারে বা মোহবশতঃ রাত্রিতে কোন দুষ্কর্ম্ম করা হইলে প্রাতঃস্নান দ্বারা তাহার পাপ নিরাকৃত হয় (২)। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে:—

(১) উভে সন্ধ্যে চ স্নাতব্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ গৃহাশ্রিভিঃ।
তিস্রশ্চ সন্ধ্যাস্থ স্নাতব্যং তপস্বিভিঃ॥
আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত বৌধায়ন বচন।

(২) অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাদ্রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং।
প্রাতঃস্নানেন তৎসর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥

যাহারা পাপকর্ম্মকারী তাহারা প্রাতঃস্নান দ্বারা পবিত্র হয়, অতএব একান্ত যত্ন সহকারে প্রাতঃস্নান করিবে; প্রাতঃস্নান দ্বারা মলাপকর্ষাদি প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রত্যবায় পরিহারাদি অপ্রত্যক্ষ ফল এই দ্বিবিধ ফলই লাভ হইয়া থাকে। উহা অলক্ষ্মী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা নাশ করে, এজন্য সকলে উহার প্রশংসা করে। প্রাতঃস্নান দ্বারা যে পাপ সমস্ত ধৌত হইয়া যায় তাহাতে সংশয় নাই (১)। উক্ত পুরাণের স্থলান্তরে আরও উক্ত হইয়াছে :— প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় সূর্য্যোদয় কালে যে স্নান সমাচরিত হয় তাহা প্রাজাপত্যের ন্যায় মহা পাতক নাশ করে; দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত এক বৎসর মাত্র প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল লাভ করেন (২)। উপরে যে সমস্ত ফল লাভের কথা বলা

(১) প্রাতঃ স্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন প্রাতঃ স্নানং সমাচরেৎ॥
প্রাতঃ স্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্ট ফলং হি তৎ।
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতং॥
প্রাতঃ স্নানেন পাপানি ধূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
৫০ অধ্যায়।

(২) উষস্যুষসি যৎস্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতক নাশনং॥
যৎফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যৈঃ কৃতৈর্ভবেৎ।
প্রাতঃ স্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
২১৫ অধ্যায়।

হইল, সমস্তই আধ্যাত্মিক। স্থলান্তরে পার্থিব ফল লাভের অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রলোভনও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গরুড় পুরাণেরই স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের আয়তন তুল্য বিপুল ভোগ্য বস্তুর কামনা করেন, তিনি মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসের জন্য নিয়মিত প্রাতঃস্নায়ী হইবেন (১)। অন্যান্য মাসাপেক্ষা মাঘ ও ফাল্গুনের প্রাতঃস্নানে কেন যে অধিকতর ফল লাভের প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু, উহার মূলে অবশ্যই কোন সদ্‌যুক্তি নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। যাহাহউক, প্রাতঃস্নানের মাহাত্ম্য সূচক আরও অনেক শাস্ত্রীয় কথা উদ্ধৃত হইতে পারিত। কিন্তু আর উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োজন নাই। যতদূর উদ্ধৃত হইল তদ্দ্বারাই বিলক্ষণ রূপে উপলব্ধি হই তেছে যে, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ ঐহিক ও পারত্রিক নানা বিধ শুভ ফলের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া প্রাতঃ স্নানের অবশ্য-করণীয়তা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ প্রাতঃ স্নানের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন কেন? "প্রাতঃ স্নানে পাপ সমস্ত ধৌত হইয়া যায়" এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন কেন? তাঁহারা কি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, অন্তঃকরণের মূল

(১) য ইচ্ছেদ্‌ বিপুলান্‌ ভোগান্‌ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহোপমান্‌॥
প্রাতঃ স্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌমাসৌ মাঘ ফাল্গুনৌ॥
২১৫ অধ্যায়।

দেশে নিহিত পাপরাশি প্রাতঃস্নানরূপ বহিঃ প্রক্রিয়ায় ধৌত হইয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? যাঁহারা ভাব শুদ্ধির এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গবিশেষ স্বরূপ যে ত্রিদণ্ডধারণ, মৌন-ব্রতাবলম্বন, জটাধারণ, শিরোমুণ্ডন, বল্‌কলাজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা প্রভৃতি, তৎসমস্ত পর্য্যন্ত ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে একান্ত নিষ্ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (১), তাঁহাদের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ মনীষিগণের পক্ষে কি বাহ্য প্রক্রিয়ারূপী প্রাতঃস্নানকে সর্ব্ব পাপহর বলিয়া বিশ্বাস করা সম্ভবপর? যাঁহারা অন্তঃশুদ্ধির মাহাত্ম্য এতদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, যদি ভাবশুদ্ধি না জন্মে তাহাহইলে পূত-সলিলা জাহ্নবীর সমস্ত জলরাশি এবং সুমেরুতুল্য স্তূপাকার মৃত্তিকারাশি দ্বারা সমস্ত জীবন ভরিয়া স্নান করিলেও শুদ্ধি লাভ হয় না (২), তাঁহাদের পক্ষে কি এরূপ বিশ্বাস সম্ভবপর? কখনই নহে। উহার মূলে এরূপ স্ত্রীজন-সুলভ আশু-বিশ্বাসের ভাব লুক্কায়িত নাই;

(১) ত্রিদণ্ড ধারণং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিন সংবেষ্টং ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্ ॥
অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীর পরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যাস্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ ॥
মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৯৯ অধ্যায়

(২) গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃত্তারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যুঞ্চাচরন্‌ শৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধ্যতি ॥

উহার মূলে গভীর সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; ঐ আপাত-প্রতীয়মান কুসংস্কারের অন্তরালে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব, জীবনের মূল সূত্র "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এই মহামন্ত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আমাদের শরীরের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, উহা সর্ব্বদাই কোন না কোন উপায়ে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নিচয়ের বহিস্করণ সাধন করিতেছে। দূষিত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত পদার্থরাশি শরীর হইতে বহিস্কৃত না হইলে নানারূপ পীড়ার উদ্ভব হইতে পারে, এই জন্যই প্রকৃতি ঐ মঙ্গলকর নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই বহিস্করণ কার্য্য কখনও মলরূপে, কখনও মূত্ররূপে, কখনও বা স্বেদরূপে, আবার কখনও বা তাদৃশ অন্য কোন প্রক্রিয়া রূপে সাধিত হইয়া থাকে। যদি ঐ সমস্ত উপায়ের কোনটী রহিত হয় তাহাহইলে দূষিত পদার্থ সমূহের বহির্গমন অংশতঃ রুদ্ধ হয় সুতরাং তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দূষিত করে এবং নানাবিধ পীড়ার সূত্রপাত হয়। আমাদের শরীরে অসংখ্য রোমকূপ রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটীই দূষিত পদার্থ সমূহের বহির্গমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার স্বরূপ। ঐ দ্বার দিয়া সর্ব্বদাই বাষ্পাবং সূক্ষ্মাকারে নানাবিধ দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত নির্গত পদার্থের জলীয় ভাগ বহির্ব্বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু মলভাগ শরীরে সংলগ্ন হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ

এইরূপ সংলগ্ন হইতে হইতে লোমকূপ সকল বদ্ধ হইতে থাকে সুতরাং তদ্দ্বারা শরীরস্থ ঐরূপ দূষিত পদার্থ সমূহ আর বহির্গত হইতে পারে না; অতএব তাহা শরীরাভ্যন্তরেই অবস্থিত থাকিয়া রক্তকে দূষিত করিতে থাকে। অপর, লোমকূপ উন্মুক্ত থাকিলে বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ু তদ্দ্বারা শরীরস্থ হইয়া রক্তবিশোধন কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু, তাহা বদ্ধ থাকাতে তাহারও অনেক ব্যাঘাত হয়। এই সমস্ত কারণে পুনঃ পুনঃই শরীর পরিমার্জ্জন একান্ত আবশ্যক। জাগ্রদবস্থায় এইরূপ পরিমার্জ্জন সম্ভবপর, কিন্তু, নিদ্রাবস্থায় তাহা হইতে পারে না। অতএব সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, নিদ্রার পরে নিদ্রাকাল-পরিত্যক্ত পূর্ব্বোক্ত দূষিত পদার্থাদির দ্বারা লোমকূপ সকল বহু পরিমাণে বদ্ধ হইয়া যায়। অপর, নিদ্রাকাল-পরিত্যক্ত ঘর্ম্মের সহিত শয্যামল বিমিশ্রিত হইয়া লোমকূপ সকলের বদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আরও সাহায্য করে। এইরূপে লোমকূপ সকল বদ্ধ থাকিলে নানাবিধ গুরুতর পীড়া হইবার একান্ত সম্ভাবনা। প্রাতঃস্নান দ্বারা এই আশঙ্কা বহু পরিমাণে তিরোহিত হয়। অপর, নিদ্রাকালে বহিরঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কার্য্য একরূপ বদ্ধ থাকাতে রক্তস্রোত অপেক্ষাকৃত প্রবল ভাবে আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের দিকে বহিতে থাকে। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া এইরূপ চলিলে একদিকে যেমন সেই যন্ত্রসমূহে রক্তাধিক্য জন্মিবার আশঙ্কা, অপর দিকে আবার

তেমনি বহিরঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শিথিলতা জন্মিবার সম্ভাবনা। প্রাতঃস্নান দ্বারা এ আশঙ্কারও লাঘব হয়; কেননা, তখন যে শরীর মার্জ্জনা করিতে হয়, তাহাতে ত্বকের উপর ঘর্ষণ পড়াতে রক্তস্রোত আভ্যন্তরিক যন্ত্রনিচয় হইতে বহির্ম্মুখীন হইয়া হস্ত পদাদি বহিরঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্যের আশঙ্কা নিবারিত, এবং হস্ত পদাদির শিথিলতা বিদূরিত হয়। কিন্তু, এসমস্ত উপকার হইতে আর একটী গুরুতর উপকার আছে, এখন সেইটীই প্রদর্শিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। ইহার কিয়দংশ যদিও উত্তর সমমণ্ডলের মধ্যগত হউক, তথাপি এদেশে গ্রীষ্মের প্রকোপ গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ দেশনিচয় হইতে নিতান্ত অল্প নহে। গ্রীষ্ম উত্তাপের ফল বই আর কিছুই নহে। উত্তাপের কার্য্য পরমাণুসমূহের বিরলতা সম্পাদন করা। যে বস্তুতে যে পরিমাণ উত্তাপ-সংযোগ হয়, সেই বস্তুর পরমাণু সকল সেই পরিমাণ বিরল ভাবাপন্ন হয়, সুতরাং তাহার সেই পরিমাণ শিথিলতা জন্মিয়া থাকে। সমস্ত জড় বস্তুর সম্বন্ধেই এই নিয়ম কার্য্যকারী। তবে পদার্থ সমূহের ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ নিমিত্ত উত্তাপের ঐ বিশেষণ প্রকৃতি তুল্যরূপে ফলপ্রসূ হইতে পারে না এইমাত্র। মনুষ্যশরীরও এই নিয়মের অধীন। বরং তথায় ইহার (উত্তাপের) প্রভাব অপেক্ষা

ক্রত সহজেই বিস্তারিত হইয়া থাকে; সামান্য উত্তাপেই উহার বিধান সকল শিথিল ভাবাপন্ন হয়। এই শিথিলতা সুধু বহিঃশরীরের উপর কার্য্য করিয়াই পর্য্যবসিত হয় না, আভ্যন্তরিক যন্ত্রনিচয়ের উপরও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। এদিকে শরীর ও মনের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের ভাব অন্যে সংক্রামিত না হইয়া পারে না। যখনই শরীর অসুস্থ হয় তখনই মনের সুস্থতার লাঘব হয় এবং যখনই শরীর সুস্থতা লাভ করে তখনই তৎসঙ্গে সঙ্গে মনেরও স্ফূর্ত্তি জন্মে। এইরূপে মনের সুস্থতাদির অনুসারে শরীরেরও সুস্থতাদি জন্মিয়া থাকে। অতএব আমরা বিলক্ষন বুঝিতে পারি, গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন মানব শরীরের যে শৈথিল্য জন্মিবার কথা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিলাম, সেই শৈথিল্য তাহার মনেও সংক্রামিত না হইয়া পারে না। বাস্তবিক শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের শিথিলভাবাপন্ন হওয়া অনিবার্য্য। অতএব ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শরীরের এই শিথিলতা অব্যাহত রূপে চলিতে দেওয়া হয়, তাহাহইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রমেই শিথিল ও নিস্তেজ হইতে থাকিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জরা, অকাল-বার্দ্ধক্য বুদ্ধিভ্রংসতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অকালে কালকবলিত করিবে বা জীবন্মৃত করিয়া রাখিবে।

আর্য্যগণ এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যখন দেশীয় প্রকৃতি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে উত্তাপ দ্বারা শিথিল ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছে, তখন তাঁহাদের দ্বারা এমন কোন নিয়মিত প্রতিকার আবশ্যক যদ্দ্বারা সেই শিথিলভাব বিদূরিত হইয়া উত্তাপ ও শৈত্যের সংঘাত জন্মিয়া স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিতে পারে। প্রাতঃস্নান দ্বারা উৎকৃষ্টরূপ এই অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইতে পারে। প্রাতঃস্নানে বিশেষরূপ শৈত্যসংস্পর্শ হয়। ঐ সময় স্বভাবতঃই স্নিগ্ধ, তাহাতে আবার শীতল জলে অবগাহন, সুতরাং তদ্দ্বারা শৈত্য-সেবন বহু পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম প্রথম এইরূপ সময়ে স্নান করিতে অবশ্য কফ, কাশি প্রভৃতির আশঙ্কা আছে; কিন্তু, কিছুদিন পরে তৎসমস্ত সহ্য হইয়া যায়। তখন ঐ সমস্ত পীড়া হওয়া দূরে থাকুক, শরীর শৈত্য-সহনশীল, দৃঢ় ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে। এদিকে নিয়মিতরূপে শৈত্য-সংযোগ নিবন্ধন দেশীয় উষ্ণপ্রধান প্রকৃতি আর শরীরের উপর আপনার অবসাদিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্য অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। ফলতঃ, শৈত্য সহ্য করণের অনেক গুণ। উহা দ্বারা শরীরের জড়তার অনেক লাঘব হয়, দৃঢ়তার বৃদ্ধি হয়, সজীবতা জন্মে এবং শ্রমশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত কারণে

শাস্ত্রকারগণ সুধু প্রাতঃস্নান নয়, পুনঃ পুনঃ পাদপ্রক্ষালন, আচমন, হস্তমুখ ধৌতকরণ, প্রভৃতি নানা আকারে শৈত্য-সহনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

অপর, কি প্রাতঃকালিক, কি মাধ্যাহ্নিক, উভয়কালীয় স্নানেরই একটী বিশেষ গুণ এই যে, উহাতে শরীর ও মন উভয়েরই নির্ম্মলতা ও স্ফূর্ত্তি জন্মে। অস্নাত অবস্থায় সাধারণতঃ মনের যে সঙ্কোচভাব থাকে, স্নান দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়। যদি শরীর ও মন উভয়ই পবিত্র ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্যেই প্রবেশ করা যায় তাহাতেই উৎসাহ জন্মে. সুতরাং তাহাতেই কৃতকার্য্যতা লাভের আশা করা যায়। অতএব দিবসের প্রথম ভাগে—প্রাতঃকালে— যিনি স্নান করেন, তিনি অবশ্যই পবিত্র শরীর ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত মন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন। অতএব আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণ অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপের ন্যায় হারাউদ্দিশে প্রাতঃ স্নানের সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া যান নাই, তাঁহাদের প্রাগুক্তরূপ বর্ণনার যথেষ্ট হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাতঃ স্নানের পর তিলকধারণ। এসম্বন্ধেও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অনেক প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন ঃ— যিনি গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ললাট দেশে ধারণ করেন, ঐ মৃত্তিকা সূর্য্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পাপরাশি নষ্ট করিয়া

থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ প্রাপ্ত হয়, গঙ্গা মৃত্তিকার তিলক ধারণ করিলে সেইরূপ পাপ রাশি নষ্ট হইয়া যায় (১)। মহর্ষি শাতাতপ বলেন ঃ—যিনি গোমতী-তীর সম্ভূত গোপীদেহ-সমুদ্ভব মৃত্তিকা মূর্দ্ধা দেশে তিলক রূপে ধারণ করেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন (২)। তিলক ধারণের এই রূপ মাহাত্ম্য-বর্ণনার হেতু কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দৃঢ় রূপে কোন কথা বলিতে সাহসী না হইলেও অনুমান বলে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উহার মূলে অবশ্য কোন না কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিহিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন ঃ—মৃত্তিকা তাড়িৎ অপরিচালক, অর্থাৎ উহার ভিতর দিয়া তাড়িৎ সহসা গতায়াত করিতে পারে না। যদি এই অপরিচালক পদার্থ ললাটে কি বক্ষে কি বাহুমূলাদিতে লেপন বা কিয়ৎ পরিমাণে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ তাড়িৎ সহসা কোন কারণে বহির্গত হইয়া শরীরের সজীবতার লাঘব করিতে পারে না, অথবা বহিঃস্থ পদার্থের তাড়িদংশ, কারণ-বিশেষের বলে শরী-

(১) জাহ্নবী তীর সম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধা বিভর্ত্তি যঃ।
বিভর্ত্তি রূপং সোহর্কস্য তমোনাশায় কেবলং ॥
আচার রত্নাকর ধৃত ব্যাসবচন।

(২) গোমতী তীর সম্ভূতাং গোপীদেহ সমুদ্ভবাং।
মৃদং মূর্দ্ধা বহেদ্ যস্তু সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
আচার রত্নাকর ধৃতশাতাতপ বচন।

রাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তড়িদাধিক্য বশতঃ কোন রূপ পীড়াজনক হইতে পারে না, অর্থাৎ শরীরস্থ স্বাভাবিক তড়িদংশ অব্যাহত রূপে সাম্যাবস্থ থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করিতে পারে।

অপর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ভেদে যে, বিভিন্ন প্রকারের (নমুনার) তিলক ধারণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় (১), তাহা বোধ হয় কেবল জাতীয় চিহ্ন-বিশেষ রক্ষার জন্য। যাহা হউক, যে রূপ ধরণের তিলকই কেন ধারণ করা না যাউক, তিলক ধারণও যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক সুতরাং কুসংস্কার মূলক সিদ্ধান্ত নহে, তাহা বোধ হয় অবাধে স্বীকার করা যাইতে পারে।

বৈদ্যক শাস্ত্রে স্নানের পর অনুলেপন অর্থাৎ গাত্রে সুগন্ধ দ্রব্য লেপনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই রূপ ব্যবস্থার হেতু নির্দ্ধারণের স্থলে উক্ত হইয়াছেঃ—সুগন্ধ দ্রব্য মনের প্রীতি জন্মায়, শরীরের তেজ ও বল বৃদ্ধি করে, স্বেদ ও দুর্গন্ধ নষ্ট করে, তন্দ্রা অর্থাৎ শরীরের গ্লানি দূর করে এবং পাপ অর্থাৎ ক্লেশ ও শ্রমাদি জনিত অসুস্থতা

(১) উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।
তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ চন্দনেন যথেচ্ছয়া॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং।
অর্দ্ধ চন্দ্রঞ্চ বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলং শূদ্রযোনিজঃ॥

আচার রত্নাকর ধৃত ব্রহ্ম পুরাণ

নিবারণ করে (১)। পুরাণ শাস্ত্রও চন্দনাদি অনুলেপনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (২)। বাস্তবিক, অগুরু, চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য লেপনে আরাম বোধ হয়, শরীর ও মনেতে যেন পবিত্রতা আইসে। দুর্গন্ধ জনিত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা দূর করা সম্বন্ধে সুগন্ধ দ্রব্য মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত সুগন্ধ দ্রব্যের রক্তবিশোধন শক্তিও আছে। এই সমস্ত কারণেই স্নানের পর অনুলেপনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

আজ কাল এদেশে গন্ধ দ্রব্যের বিশেষ আদর দেখা যাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, সাধারণতঃ ল্যাবেণ্ডার, ওডিকলোন প্রভৃতি যে সমস্ত গন্ধ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের গন্ধ কিছু উগ্র, সুতরাং আশুপ্রীতিকর হইলেও মস্তিষ্কের কিছু উত্তেজনা জন্মায়। অস্মদ্দেশ প্রচলিত অগুরু চন্দনাদির এই দোষ নাই। তাহাদের গন্ধ এত আশুপ্রীতিকর না হইলেও বেশ মিষ্ট এবং স্নিগ্ধ। যাহাহউক, চন্দনাদির পরিবর্ত্তে বিলাতি সুগন্ধানুলেপনে তাদৃশ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

সন্ধ্যা তর্পণাদি।—এই বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম্মের যোগ দৃষ্ট হয়; অতএব ইহা ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে।

---

(১) প্রীতি তেজস্করং বৃষ্যং স্বেদ দৌর্গন্ধ নাশনং।
তন্দ্রাপাপোপশমনং শ্রমঘ্নমনুলেপনং॥
রাজবল্লভ।

(২) চন্দনাগুরুকর্পূর কুঙ্কুমোশীর পদ্মকৈঃ।
অনুলিপ্তো নরৈর্ভক্ত্যা দদাতি মানসেপ্সিতং॥
আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত ভবিষ্যবচন।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য।

সমিৎ পুষ্পাদি আহরণ।

জগচ্চক্ষু দিনমণি যখন প্রাচীদেশে আপনার তেজঃপুঞ্জ কান্তি ঝলসিত করিয়া হাস্যমুখে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, জগৎ যখন তাঁহার সেই মৃতসঞ্জীবনী দৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেইরূপ মধুর হাস্যে হাসিয়া উঠিল, তখন—সেই সুখ মুহূর্ত্তে—আর্য্য পুরুষ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সমিৎ পুষ্পাদি আহরণার্থ বহির্গত হইলেন। শীতের প্রাখর্য্য নাই, উত্তাপের প্রচণ্ডতা নাই; অন্ধকার তিরোধান করিয়াছে, আলোক জগচ্ছরীর বিভাসিত করিয়াছে, এই মনোরম সময়ে আর্য্যপুরুষ সমিৎপুষ্পাহরণে বহির্গত হইলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন, এই উৎকৃষ্ট সময়ে পাদচারণা করিলে নিদ্রাজনিত অবসন্নতা দূরে গমন করে, বিশুদ্ধ বায়ুর হিল্লোলে শরীর শীতল হয়, শীতল বায়ুর বলবিধায়িনী শক্তি অঙ্গনিচয়ের বল বিধান করে, এবং শরীরের ও মনের প্রসন্নতা জন্মে। আরও বলেন, এই সময় যাঁহারা ব্যায়াম চর্য্যা করেন তাঁহারা জরা, বার্দ্ধক্য এবং নানারূপ উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে বহু পরিমাণে নিরাপদ থাকেন। কিন্তু, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই উৎকৃষ্ট সময়ে কি ব্যায়াম, কি প্রাণায়াম

কিছুই করিতে উপদেশ প্রদান করেন না। তাঁহারা ই সময়ে সমিৎপুষ্পাদি সমাহরণার্থ উপদেশ প্রদান রেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে, স্বাস্থ্যের দোহাই য়া, প্রাতভ্রমণ এবং ব্যয়ামের অবশ্য-করণীয়তা বিধিবদ্ধ রেন, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার কিছুই না করিয়া াত্র সমিধাদি সংগ্রহার্থ উপদেশ প্রদান করেন। একের লক্ষ্য স্বাস্থ্যরূপ মহারত্ন, অপরের লক্ষ্য সামান্য মিৎপুষ্প; এক সম্প্রদায় বিজ্ঞানের অখণ্ড্য যুক্তি দর্শন পূর্ব্বক সাধারণকে আপনাদের মতানুবর্ত্তী রিতে প্রয়াস পাইতেছেন, অপর সম্প্রদায়—ন্যায় নাই, ক্তি নাই—কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আপনাদের দিকে াধারণকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! চিকিৎসাবিজ্ঞানের যাহা ধ্রুব লক্ষ্য, যে লক্ষ্য সংসাধন ন্য তিনি নানারূপ উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন করেন, ধর্ম্ম জ্ঞান সেই লক্ষ্যকে অলক্ষিতভাবে সংসিদ্ধ করিতে ছেন, তাঁহার সেই প্রদর্শিত ফল অনায়াসে করতলে দান করিতেছেন। যুক্তির আড়ম্বর নাই, হেতু দর্শনের ব্যগ্রতা নাই, অথচ তজ্জনিত শুভ ফল প্রদান রিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহা অপেক্ষা আরও গ্রসর হইয়াছেন। আমরা শাস্ত্রোক্ত সমিৎ পুষ্পাদি মাহরণ বিষয়ক বিধান নিচয়ের কতিপয় উদ্ধৃত করিয়া মাদের এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিব। আমরা খাইতে যত্ন করিব, অধুনাতন ইউরোপীয় স্বাস্থ্য-

বজ্ঞান (Hygene) শাস্ত্র তার স্বরে গগণ মেদিনী বি
কম্পিত করিয়া যে প্রাতভ্র মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া
থাকেন, আমাদেব মৌনব্রতাবলম্বী বনবাসী শাস্ত্রকার
গণের বংশ-লেখনী-সমুদ্ভূত ভূর্য্যপত্র-বিলিখিত স্মৃতি
বং পুরাণ শাস্ত্রনিচয় সেই প্রাতভ্র মণ জনিত শুভ ফল
না আড়ম্বরে সকলের ঘরে ঘরে প্রদান করিতেছেন,
বং স্বধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহা অপেক্ষাও
হু দূরে অগ্রসর হইয়াছেন।

শাস্ত্রনিচয় যজ্ঞার্থ খদির চন্দন, পলাশ, উড়ুম্বর
ভৃতি যে সমস্ত সমিধ ব্যবস্থিত করিয়াছেন তাহাদের
পকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যজ্ঞ সমিধের মধ্যে
সৎসংখ্যকের গন্ধ অতি উপাদেয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে
গন্ধি দ্রব্যের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে স্থানান্তরে
াহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ,
াশিষ্টগুলি তিক্ত ও কষায় গুণবিশিষ্ট। যে সমস্ত
্যর স্বাভাবিক যে গুণ, তাহা স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভক্ষণে
র্দনে, সংক্ষেপতঃ সর্ব্ব প্রকার সংঘর্ষেই সংক্রামিত
ইয়া থাকে। তবে ভক্ষণে সাধারণতঃ তাহার ক্রিয়া
তদূর প্রকাশিত হইতে পারে, স্পর্শনে কি আঘ্রাণে
খনই ততদূর নহে, এইমাত্র প্রভেদ। কষায় ও তিক্ত গুণ-
শিষ্ট বস্তুনিচয় সাধারণতঃ পিত্তনাশকারী। উহাদের
সকল ভক্ষণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ বা যে কোন ক্রমেই
বিস্থ হউক, তাহাতেই পিত্তের প্রকোপ নিবারণ

ভাব প্রকাশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৈদ্যগ্রন্থে কুশের গুণ সকল পরীক্ষিত হইয়াছে (১)"। যাহাহউক, উক্ত গুণ বা তাদৃশ অন্য কোন গুণ থাকা জন্যই যে ঐ রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর পুষ্পচয়ন। এসম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা রূপ বিধান দৃষ্ট হয়। তৎসমস্তের বিস্তৃত বিবরণ দূরে থাকুক্ সার সংগ্রহও এই প্রবন্ধে সম্ভাবিত নহে। আমরা মাত্র দুই চারিটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই বিধানের উপযোগিতা সমিৎকুশা-হরণ হইতেও অধিকতর।

এই রূপ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ পুষ্প সাধারণতঃ সকলেরই উত্তোলন করিতে হয় অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণ কোন্ কোন্ পুষ্প শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে অসংখ্য দেব দেবীর নামোল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে মাত্র শ্রীবিষ্ণুর নাম নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য এইযে,তিনি সকলেরই উপাস্য। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রাদায়ী দিগেরই বিষ্ণু পূজা করিতে হয়। অবশ্য যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাকে সেই মন্ত্রোক্ত দেবতারই পূজা করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার "শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনা" না করিয়া উপায় নাই।

---

(১) ১২৯২ সনের আষাঢ় মাসের "বান্ধবে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাম কৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ লিখিত "শাস্ত্রতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পূজা কালেই হউক্, বা শ্রাদ্ধ কি দানাদি কালেই হউক্, তাঁহাকে "শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কাম,, হইতেই হইবে। অতএব, যখন দেখা যাইতেছে, শ্রীবিষ্ণু কোন না কোন আকারে সকলেরই উপাস্য, তখন সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, সকলকেই তাঁহার প্রীতিসাধক পুষ্প সংগ্রহ করিতে হয় এবং মাত্র তাঁহার প্রীতিসাধক বলিয়া যেযে পুষ্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম করিলেই প্রকারান্তরে জন সাধারণের নিয়মিত রূপে যেসমস্ত পুষ্প উত্তোলন করিতে হয় তাহার নামোল্লেখ করা হয়। বলা বাহুল্য, যে সমস্ত পুষ্প নিয়মিত রূপে সাধারণের উত্তোলন করিতে হয়, তৎসমস্তের সহিতই নিত্য কার্য্যের সংস্রব এবং তৎসমস্তের সহিতই স্বাস্থ্য ঘনিষ্ঠতর রূপে সম্বদ্ধ। অতএব আমরা — পুষ্প চয়ন প্রথার উপযোগিতা প্রদর্শনের পূর্ব্বে—কোন্ কোন্ পুষ্প সর্ব্বদেবশিরোমণি সর্ব্বোপাস্য শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিসাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহারই উল্লেখ করিব (১)।

নারদীয় সপ্তম সহস্রে ত্রিলোকপাবন ভগবান কহিতে ছেন ঃ—মালতী,বকুল,শেফালিকা, নবমল্লিকা, তগর * * * এই পঞ্চবিংশতি পুষ্পকে আমি লক্ষ্মীর ন্যায় প্রীতি

---

(১) পুষ্প সমিধাদি সমস্তই পৌত্তলিক পূজার উপকরণ। এই রূপ পূজার কোন ধর্ম্মনৈতিক উপযোগিতা আছে কিনা, তাহা ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে। এস্থলে, পুষ্প সমিধাদি সংগ্রহের কি রূপ বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা আছে তাহাই মাত্র সমালোচিত হই-তেছে।

করিয়া থাকি (১)।

[illegible] [illegible] উক্ত হইয়াছে — উগ্রগন্ধী, গন্ধবিহীন, [illegible] কীটযুক্ত, রক্তবর্ণ, চৈত্যবৃক্ষোদ্ভব, শ্মশান ভূমিজাত এবং অকাল জাত এই সমস্ত পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রদান করিবে না (২)।

যে পঞ্চবিংশতি পুষ্প শ্রীবিষ্ণুর নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় প্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশটিই শ্বেতবর্ণ ও সদ্‌গন্ধযুক্ত। স্বভাবতঃ, শ্বেতবর্ণ বস্তু দেখিলে মন কিছু প্রফুল্ল হয়। যে বস্তুর তাদৃশ অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, তাহারও যদি বর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেত বা শ্বেতাভ হয়, তাহাও যেন মনে কিছু আনন্দের উদ্রেক করে। যদি তাহার সঙ্গে সদ্‌গন্ধ মিলিত থাকে, তবে তাহার সেই মনোহারিত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন সেই

(১) মালতি বকুলাশোক শেফালি নবমালিকাঃ।
আম্রাঃ তগরাঙ্কোঠ মল্লিকা মধুপিণ্ডিকাঃ॥
যূথি অষ্টাপদং কুন্দং কদম্বং মধুপিঙ্গলং।
পাটলা চম্পকং হ্রুকং লবঙ্গ অতি মুক্তকং॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লার করকং দ্বিজ।
পঞ্চবিংশতি পুষ্পাণি লক্ষ্মী তুল্য-প্রিয়াণি মে॥

শব্দ কল্প দ্রুম।

(২) উগ্রগন্ধীনি গন্ধহীনানি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যাঙ্গজাতানি কণ্টকীনি তথৈবচ॥
রক্তানি যানি পুষ্পাণি চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
শ্মশান জাতানি যানি চাকাল জানি চ॥

শব্দকল্পদ্রুম।

বস্তুর দর্শনে ও আঘ্রাণে মনে এক প্রকার বিমল আনন্দের উদ্রেক হইয়া উঠে। মনের এই আনন্দ শুধু মনেই পর্য্যবসিত হয় না, উহার কার্য্যকারিতা শরীরেও প্রকাশিত হয়। মনের সহিত শরীরের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাতে মনের এইরূপ আনন্দে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু না কিছু উপকার না দর্শিয়া পারে না। বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, শ্বেত পুষ্প নিচয় অক্সিজেন বিকীর্ণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল শ্বেত পুষ্পের গন্ধ অতি মধুর তাহাদের অক্সিজেন-জননের ও বিকিরণের শক্তি সাতিশয় প্রবল। অক্সিজেন যে জীবসাধারণের বিশেষতঃ মানব কুলের পক্ষে পরম হিতকর, এমন কি প্রাণপ্রদ তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এ দিকে বিষ্ণু পূজায় শ্বেত পুষ্প নিচয়ই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

পূজার প্রধানতম লক্ষ্য ইষ্টদেবের প্রীতিসাধন। কাহারও প্রীতিসাধন করিতে হইলে সাধারণতঃ তাঁহার প্রিয় দ্রব্য গুলি তাঁহাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়। এই স্বাভাবিক ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া বিষ্ণুপাসক বিষ্ণুপ্রিয় পুষ্পসমূহ সংগ্রহার্থে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাঁহার এই ব্যগ্রতার ফল—বহুসংখ্যক শ্বেতবর্ণ সুগন্ধি কুসুমসংগ্রহ। এই সংগৃহীত সুগন্ধি কুসুমনিচয় যে ঘনীভূত অক্সিজেন (ওজোন বায়ু) পরিত্যাগ করে, তাহা শরীরস্থ হইয়া রক্তবিশোধন কার্য্যের সহায়তা করে, সুতরাং তদ্দ্বার

স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। অপর, উগ্রগন্ধ, গন্ধবিহীন, ও অন্যান্য দোষযুক্ত পুষ্প সমূহ যে বিষ্ণুপূজায় অবিহিত বলিয়া কেন উক্ত হইয়াছে, তাহাও এতদ্দ্বারাই অনুমিত হইতে পারে। এই সমস্ত পুষ্পেরও যে কোন কোনটির অক্সিজেন বা ওজোন বিকিরণের ক্ষমতা নাই তাহা নহে; তবে উহাদের উগ্রতাদি দোষ দ্বারা ঐ গুণভাগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তাই এই সমস্ত পুষ্প কেশবার্চ্চনে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর কুসুম সংগ্রহের পদ্ধতি। যে সমস্ত পুষ্প ইষ্টদেবার্চ্চনে বিহিত বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহা কিরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে? পুষ্পব্যবসায়ীর নিকট ক্রয় করিয়া কিম্বা কাহারও দ্বারা উত্তোলন করাইয়া লইলে কি চলিবে না? না। সমিৎপুষ্প কুশাদি সমস্তই ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে আহরণ করিতে হইবে। যদি কেহ তাহা না করিয়া ক্রীত বা শূদ্রোত্তোলিত পুষ্প দ্বারা পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহাহইলে তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হন (১)।

---

(১) সমিৎপুষ্প কুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ব্রজত্যধঃ॥
আচার রত্নাকর ধৃত হারীতবচন।

(ক) স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণোক্ত "পুষ্পধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বীর ক্রয়ক্রিয়াহৃতৈঃ।" এই শ্লোকাংশ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে স্থলে বিক্রেতা উপযাচক হইয়া পুষ্প বিক্রয় করে তথায় ক্রীত পুষ্পে দোষ নাই। যাহাহউক, এই বিধান যখন শুধু প্রতিগ্রহণ স্থলের জন্য বিহিত, তখন ইহা আমাদের সমালোচ্য নহে।

সুধু ইহাই নহে; সুধু এই নিবর্ত্তক বিধির ভয় প্রদর্শনেই স্বহস্তে কুসুম চয়নের মাহাত্ম্য প্রকটিত হয় নাই, প্রবর্ত্তক বিধির প্রলোভনসূচক বাক্যাবলীতে ও তাহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছেঃ— যে ব্যক্তি বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া স্বহস্তোত্তোলিত পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন, ভগবান্ তাঁহার সেই পুষ্প আদরের সহিত মস্তকে ধারণ করেন এবং তাঁহাকে স্বলোকে (বিষ্ণু লোকে) স্থান দান করেন (১)।

স্বহস্তে পুষ্পচয়নের এত মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে কেন? যে পুষ্প অন্যে উত্তোলন করিলে পূতিগন্ধময় হইয়া যায়, তাহাই কি স্বহস্তে চয়ন করিলে মনোরম গন্ধে প্রাণ মন আকুলিত করে? যে পুষ্প অন্যের দ্বারা উত্তোলিত হইলে সামান্য কাচের গুণ ধারণ করে, তাহাই কি স্বহস্তে উত্তোলিত হইলে সুবর্ণময় হইয়া যায়?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শ্বেত সুগন্ধি পুষ্প সমূহ প্রাণপ্রদ ওজোন (Ozone) বায়ু বিকীর্ণ করে এবং বিষ্ণু পূজক সেই সমস্ত পুষ্প দ্বারা ইষ্ট দেবের পূজা করিতে যাইয়া অজ্ঞাত সারে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কার্য্যে সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি এই পুষ্পনিচয় তিনি স্বহস্তে

(১) উপহার্য্যাণি পুষ্পাণি স্বয়ং কর্ম্ম পরায়ণঃ।
যোমাম্ পালয়েদ্ ভূমে মম কর্ম্ম পথেস্থিতঃ॥
পুষ্পাণি তস্য যাবন্তি মম মূর্দ্ধণি ধারয়েৎ।
সম্যক্ পুষ্কলং কর্ম্ম মম লোকায় গচ্ছতি॥
শব্দ কল্প দ্রুম।

উত্তোলন করেন, তবে তাঁহার ঐ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কার্য্যের আর ও সাহায্য হইতে পারে। কেননা, যদি মাত্র পূজা করিলেই উক্ত পুষ্প সমূহের সংস্পর্শ লাভ করেন, তাহা হইলে যে পরিমাণ ওজন (Ozone) বাষ্প শরীরস্থ করিতে পারেন, উত্তোলন ও পূজা উভয় কার্য্য করিলে অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক পারেন; সুতরাং তজ্জনিত উপকারও অবশ্যই অধিকতর রূপে লাভ করিতে পারেন। শুধু ইহাও নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাতভ্রমণ জনিত নানাবিধ গুরুতর অভীষ্টও সংসিদ্ধ করিতে পারেন।

অপর, স্বীয় যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা যে বস্তু লাভ করা যায় তাহা ব্যবহারে যেমন মনের তৃপ্তি জন্মে, অন্যকর্তৃক প্রদত্ত বস্তু ব্যবহারে প্রায়ই তদ্রূপ জন্মেনা। আপনি সমস্ত উদ্যোগ করিয়া শাকান্ন রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করিলে যে পরিমাণ তৃপ্তি জন্মে অন্যের প্রদত্ত পক্কান্নেও ততদূর জন্মে না। কুসুমচয়ন সম্বন্ধেও সেই রূপ। যে পুষ্প স্বহস্তে উত্তোলন করা যায় তাহা ইষ্ট দেবকে দিতে যেমন মনে পরিতৃপ্তি জন্মে, অন্যের আনীত বা উত্তোলিত পুষ্প দিতে কখনই সেরূপ জন্মিবার কথা নহে। স্বহস্তোত্তোলিত পুষ্প দ্বারা অর্চনা কালে পূজক যেমন স্বীয় অভীষ্ট দেবকে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারেন :—
"হে দেব, দেব, তোমার ঐ পবিত্র পাদযুগল পূজা করিবার নিমিত্ত আমি বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে এই কুসুমনিচয় সংগ্রহ করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই পূজা

গ্রহণ কর, আমার যত্ন ও আগ্রহ সকলই সফল হউক,, অন্যোত্তোলিত কুসুম দ্বারা পূজা কালে কখনই তিনি তদ্রূপ বলিতে পারেন না। বাস্তবিক, আপনার যত্নের ধন, পরিশ্রমের ফল, যতদূর তৃপ্তিবিধায়ক, অন্যের প্রদত্ত বা ক্রয়ক্রীত দ্রব্য কখনই ততদূর নহে। আপনার শ্রমলব্ধ দ্রব্য পূজনীয় জনের পদতলে উৎসর্গ করিতে যেমন তৃপ্তি জন্মে, অন্যদত্ত দ্রব্য প্রদান কালে কখনই তদ্রূপ জন্মে না।

স্বহস্তে পুষ্পচয়নের আরও উপযোগিতা আছে। সময় সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, পূজার্থী পুষ্পচয়ন করিতে যাইয়া পুষ্প সমূহের আশ্চর্য্য শোভা নিরীক্ষণে তৎ সমস্তের মূলে বিশ্বশিল্পীর মঙ্গলহস্ত জাজ্বল্যমান রূপে উপলব্ধি করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সাধক পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরম হংসের সম্বন্ধে আমরা এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়াছি। তিনি একজন পূজক ব্রাহ্মণ ছিলেন; প্রতিদিন প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পোত্তোলন করিয়া নিষ্ঠা সহকারে অধিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা করিতেন। এক দিন ঐরূপ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; সম্মুখে প্রস্ফুটিত পুষ্পখচিত ফলপল্লবযুক্ত উদ্যান আলোকিত এবং আমোদিত করিতেছে; অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঐ মনোরম পুষ্পনিচয়ের মনোহারিত্ব নিরীক্ষণে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি ঐ পুষ্প সমূহের অন্তরালে বিধাতার সুনিপুণ হস্ত জলন্ত রূপে দেখিতে পাইলেন; এই

তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, প্রবল ঈশ্বরপ্রেম অঙ্কুরিত হইল; এই অনুরাগের এবং প্রেমের ক্রমিক বিকশনেই তিনি আজ সিদ্ধপুরুষ, সকলের পূজার্হ। বাস্তবিক, মনোরম পুষ্পনিচয় যখন বৃক্ষের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া উদ্যানের রমণীয়তা সম্পাদন করিতে থাকে, সুস্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে পুষ্প সমূহ মৃদুমন্দ দুলিয়া দুলিয়া যখন নীরবে জগৎকে আপনার রূপসুষমা প্রদর্শনে বিশ্বশিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের মহিমা-কাহিনী শুনাইতে থাকে এবং মধুলুব্ধ মধুকরনিচয় যখন গুন গুন্ রবে বিশ্বপিতার নাম গান করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া মধুপান করিতে থাকে, তখনকার দৃশ্য অতি মধুর, অতি তৃপ্তি-বিধায়ক। নিবিষ্ট চিত্তে যিনি কুসুম নিচয়ের এই সুমধুর ভাব অবলোকন করেন তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করেন; পুষ্পকে শিক্ষা গুরু মনে করিয়া সাদরে তাহাকে হৃদিমূলে স্থাপন করেন। এইসমস্ত কারণেই অন্তস্তলদর্শী শাস্ত্রকারগণ স্বহস্তে পুষ্পচয়নের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং এইসমস্ত কারণেই অন্যানীত বা ক্রয়ক্রীত পুষ্প ব্যবহারে অধোগতির ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সমিৎপুষ্পাদি সমাহরণ সম্বন্ধে উপরে যাহা উক্ত হইল তদ্দারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্র যদিও ধর্ম্ম কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই সমিৎ কুশাদি আহরণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তৎসহ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের

যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সংসিদ্ধ হইতেছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে লক্ষ্য স্বাস্থ্য, ফলও স্বাস্থ্য। স্মৃতি ও পুরাণাদির লক্ষ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহার ফল — স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম কর্ম্ম উভয়ই। এখন যদি গণিত শাস্ত্রের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া এই উভয় অতুল্য পদার্থ হইতে সাধারণ পদার্থ "স্বাস্থ্য„ বিযুক্ত করি তাহা হইলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের (Hygiene শাস্ত্রের) দিকে "শূন্য„ এবং স্মৃত্যাদির দিকে "ধর্ম্মকর্ম্ম, অবশিষ্ট থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে (Hygiene) শাস্ত্রাপেক্ষা স্মৃত্যাদির অন্ততঃ এসম্বন্ধে গুরুত্ব অধিক। এইরূপে আরও বহুস্থানে (Hygiene) শাস্ত্রাপেক্ষা স্মৃত্যাদির গুরুত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে আমাদের আর অধিক দূরে গমনের অধিকার নাই। যাহা হউক্, আমাদের দেশের পক্ষে ইউরোপীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অপেক্ষা যে স্মৃত্যাদির গুরুত্ব স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধেও অধিকতর তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতঃপর বেদবিদ্যাভ্যাস। আহ্নিকাচার তত্ত্ব এবং আচার রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে সমিৎপুষ্পাদি সমাহরণের পর্ব্বে বেদবিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা সমিৎপুষ্পাদি আহরণের উপযোগিতা প্রদর্শন করিলাম; বেদবিদ্যাভ্যাসের উপযোগিতা উপনয়ন-বিধি-সমালোচন-স্থলে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য।

এই যামার্দ্ধে অনুষ্ঠেয় কার্যনিচয়ের সহিত পারিবারিক কর্ত্তব্যনিচয়ের সম্বন্ধই অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতর; এই নিমিত্ত তৎসমস্ত "পরিবার নীতি,, শীর্ষক পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধ কৃত্য।

প্রাতঃস্নানের বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন মধ্যাহ্ন স্নানের সময় উপস্থিত। যদিও এই স্নানের মাহাত্ম্য প্রাতঃস্নানের ন্যায় অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই, তথাপি ইহার অবশ্য-করণীয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের কারণ নাই। শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ যে যে কারণে প্রাতঃস্নানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহা নিতান্তই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু, কালক্রমে যখন সমাজে বিলাসিতা ও আপাত-আরাম-প্রিয়তা প্রবেশ করিল, তখন হইতেই সাধারণ সমাজ আশু-ক্লেশকর কিন্তু পরিণাম-শুভাবহ প্রাতঃস্নান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতেই প্রাতঃস্নান ও মধ্যাহ্ন স্নান এই দ্বিবিধ স্নানের পরিবর্ত্তে মাত্র

শেষোক্ত স্নানই প্রচলিত রহিয়াছে। এই স্নান সমাজ মধ্যে এতই বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে যে সদ্যোজাত শিশু হইতে নবতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই ইহার শরণাপন্ন; সুতরাং এই প্রথার উপযোগিতা বর্ণনার জন্য প্রয়াস পাওয়া বাহুল্য মাত্র। স্থূলতঃ, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, যে প্রথা সমগ্র সমাজ, জনসাধারণে আবহমান কাল হইতে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহা নিতান্তই সারগর্ভ না হইলে কখনই চিরস্থায়ী থাকিতে পারিত না।

স্নানের পূর্ব্বে শরীরে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা নিতান্তই শুভাবহ। মনুষ্য-শরীরে যেসমস্ত পদার্থ আছে, তৈল জাতীয় পদার্থ তাহার অন্যতম। মনুষ্য শরীর নানা কারণে সর্ব্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; সেই ক্ষয় প্রাপ্ত অংশ পূরণ জন্য আহারাদি নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা নানাবিধ পদার্থ শরীরস্থ করা হইয়া থাকে। যে জাতীয় পদার্থ শরীরস্থ হয়, তদ্দ্বারা শারীরিক তজ্জাতীয় পদার্থেরই পূরণ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং শরীরস্থ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অভাব দূরীকরণ জন্য বিভিন্ন জাতীয় বস্তুই শরীরস্থ করা কর্ত্তব্য। এই যুক্তি অনুসারে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মানব শরীরে যে তৈলাক্ত পদার্থ আছে, তাহার ক্ষয়-প্রাপ্তি হইলে, তৎপূরণার্থ তৈল বা তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ কোন উপায়ে শরীরস্থ করা আবশ্যক। রন্ধন কার্য্যে

অনেক সময় তৈল ও ঘৃত ব্যবহারের রীতি প্রচলিত থাকায়, এবং নানা জাতীয় তৈল যুক্ত দ্রব্য আহার্য্য-মধ্যে পরিগণিত থাকায় এই আবশ্যকতা বহু পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু, তৈল মর্দ্দন দ্বারাও ঐ উদ্দেশ্য অল্প সাধিত হয় না। বরং তৈল মর্দ্দনের উপকারিতা উহা অপেক্ষাও অধিক। ইহাতে তৈল শরীরস্থ হইয়া এক দিকে যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত তৈলাক্ত পদার্থের অভাব পূর্ণ করে, অন্য দিকে তেমনি আরও কতিপয় মহদুদ্দেশ্য সাধিত করে। মস্তকে উত্তম রূপে তৈল বসাইয়া দিলে বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়, কেশ গভীর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তাহার অকালপক্কতার আশঙ্কা তিরোহিত হয়; মস্তিষ্ক শীতল এবং সতেজ থাকাতে মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে, মস্তক-মল (খুস্কী) প্রভৃতির উপদ্রব হ্রাসিত হয় এবং এইরূপ আরও নানা প্রকার হিত সাধিত হইয়া থাকে। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বক মসৃণ এবং তাহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ অব্যাহত থাকে। খুজলী, চুলকনা প্রভৃতি বহুবিধ চর্ম্ম রোগ প্রশমিত থাকে (১)। এই সমস্ত কারণে তৈল মর্দ্দন স্নানের অঙ্গ বিশেষ রূপে

(১) সকলেই অবগত আছেন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির একটী প্রধান অঙ্গ তৈল। বহু দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তৈল ব্যবহারে উপশম হয় ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত তৈলের সহিত বহুবিধ ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত শরীরস্থ করা সম্বন্ধে তৈলের ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর নাই। তদ্ব্যতীত তৈল স্বয়ংও শরীরস্থ হইয়া উপকার দর্শায়।

ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। বৈদ্যক শাস্ত্রে তৈলের উপকারিতা বর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে ঃ— দুগ্ধ অপেক্ষা মাংস অষ্ট গুণ উপকারক, মাংসাপেক্ষা ঘৃত অষ্ট গুণ এবং ঘৃতাপেক্ষা তৈল অষ্ট গুণ উপকারক; এস্থলে তৈল ভক্ষণ না বুঝিয়া মর্দ্দন বুঝিতে হইবে (১)। এইরূপ বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহা হইতে আমরা তৈল মর্দ্দনের আবশ্যকতা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারি। বাস্তবিক, এইরূপ বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল তৈল মর্দ্দনে প্রবৃত্তি জন্মান ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। কর্ণ-গহ্বরে এবং নাভীতে তৈল প্রদানের ও ব্যবস্থা আছে, তাহাও যে উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৈল ব্যবহারের এই যে সমস্ত ব্যবস্থা ইহা শুধু মধ্যাহ্ন স্নানের জন্যই বিহিত হইয়াছে। প্রাতঃস্নানের কালে ইহা ব্যবস্থিত হওয়া দূরে থাকুক মহা পাপকর এমন কি মদ্যবিলেপন তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (২) এইরূপ বর্ণনা বিশেষ সারগর্ভ। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি লালা-স্বেদ-সমাকীর্ণ এবং অত্যন্ত মলিনতাজড়িত

---

(১) পয়সোহষ্ট গুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতং।
ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলং মর্দ্দনান্ন তু ভক্ষণাৎ॥
রাজবল্লভ।

(২) প্রাতঃস্নানে চ শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপী সমং তৈলং তস্মাৎ তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।
আহ্নিকাচার তত্ত্ব ধৃত ব্যাস বচন।

থাকেন (১)। এইরূপ সময়ে শরীরে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে তখনই নিদ্রাকাল-পরিত্যক্ত প্রাগুক্ত দূষিত পদার্থ-নিচয়ের অণু সকলও বহু পরিমাণে রোমকূপ দ্বারা শরীরস্থ হইয়া নানা প্রকার পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারে (২)। মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দনে সে আশঙ্কা অতি অল্প। কেননা, যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন তাঁহাদের শরীরসংলগ্ন উল্লিখিত দূষিত পদার্থ সমূহ বহু পরিমাণে তখনই ধৌত হইয়া যাওয়াতে রোম কূপ সকল উন্মুক্ত থাকে, সুতরাং মধ্যাহ্ন স্নান কালে তৈল মর্দ্দন করিলে তাহা শরীরস্থ হইয়া অভিলষিত উদ্দেশ্য সহজেই সংসিদ্ধ করিতে পারে। আর যাঁহারা প্রাতঃস্নান না করেন তাঁহারাও সাধারণতঃ নিদ্রোত্থিত হইয়া গাত্রমার্জ্জনী প্রভৃতি দ্বারা প্রায়ই গাত্রমার্জ্জনাদি করায় এবং গাত্রবস্ত্রাদি ব্যবহার করায় তৎসহ প্রাগুক্ত দূষিত বস্তু সমূহের অন্ততঃ কিয়দংশও দূরীভূত হয়, সুতরাং তৎপর মধ্যাহ্নস্নান কালে তৈল মর্দ্দনের লক্ষ্য অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। তবে প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয়বার স্নানের সময় (মধ্যাহ্নস্নানের সময়) তৈল মর্দ্দনে যত উপকার আশা করা যায়, মধ্যাহ্নস্নায়ীর পক্ষে তত দূর আশা করা

(১) [illegible] শয়নাচ্ছুরিতঃ শুমান্।
ইত্যাদি আহ্নিকাচার তত্ত্ব

(২) ১০ পৃষ্ঠায় মন্তব্যে উক্ত হইয়াছে।

যায় না। প্রাতঃ ও অপরাহ্ন এই দুই সময়ে স্নানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এরূপ একটী হেতু প্রদর্শিত হইতে পারে।

অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় শাস্ত্রকারগণ তৈল ব্যবহার সম্বন্ধেও তিথ্যাদির বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে;— চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বে তৈলব্যবহারকারী বিণ্মূত্রভোজন নামক নরকে গমন করে (১)। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে; অষ্টমী, ষষ্ঠী, নবমী, চতুর্দ্দশী এবং পর্ব্বসন্ধি অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সহিত প্রতিপদের সন্ধিসময়, এই সমস্ত তিথিতে তৈল ব্যবহার করিবে না (২)। এতদ্ব্যতীত নক্ষত্রভেদেও তৈল ব্যবহারে নিষেধ দৃষ্ট হয়। তিথি নক্ষত্রাদি ভেদে মানব শরীরে যে নানা রূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ইহা পরীক্ষিত সত্য।

(১) চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু [illegible] পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম [illegible] নরকং [illegible]॥
[illegible]।

(২) অষ্টম্যাঞ্চ তথা ষষ্ঠ্যাং নবম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোহভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত [illegible] তৈলেন [illegible]॥
[illegible] ধৃত।

বিশেষতঃ উল্লিখিত তিথি ও নক্ষত্রের ভোগ কালে অনেক সময়েই শরীরের ভাবান্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে। শরীরের ঈদৃশ বিকার নিতান্ত সামান্য হইলেও তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। এই বিকৃতির প্রধানতম কারণ প্রায়ই রসবৃদ্ধি। তৈল ব্যবহারেও স্বভাবতঃ কিছু রসাধিক্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত তিথিতে তৈল ব্যবহারে শরীরে অধিক পরিমাণে রস জন্মিয়া পীড়ার উদ্ভব করিতে পারে। নক্ষত্র সম্বন্ধেও বোধ হয় ঐ কথা। সম্ভবতঃ এইরূপ কারণেই কতিপয় নির্দ্দিষ্ট তিথি ও নক্ষত্রের ভোগকালে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, এই সমস্ত বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত বিধায় এস্থলে আমাদের আর দূরে যাইবার অধিকার নাই, যত দূর গিয়াছি তাহাই অধিক।

শরীরে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দন শেষ হইলেই "আপো নারায়ণঃ" এই বলিয়া মস্তকে জল প্রক্ষেপের বিধান (১)। এইরূপ জল প্রদানে "উর্দ্ধ উঠা" অর্থাৎ মস্তিস্কে রক্তাধিক্য জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না, অপিতু "জল

(১) কেহ কেহ বলেন "নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [illegible] মস্তকে জল প্রক্ষেপ করা ব্যবহিত হইয়াছে। যাহাহউক, [illegible] মধ্যে কাহারও কোন পার্থক্য নাই।

নারায়ণ" এই ধারণা থাকায় কোন হিন্দুই সমর্থ থাকে বিনা কারণে জলে নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগ করেন না। ইহাতে পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয়, সুতরাং অনেক পীড়ার আশঙ্কা নিদূরিত হয়।

অনন্তর, স্নানার্থ জলাশয়ে অবতরণ করিবে (১)। কিরূপ জলাশয়ে স্নান করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ স্থলে পূজ্যপাদ মহামতি মনু বলিয়াছেনঃ— নদী, দেবখাত অর্থাৎ হ্রদ, তড়াগ অর্থাৎ দীঘী, সরঃ অর্থাৎ পুষ্করিণী, গর্ত্ত অর্থাৎ ৮০০০ ধনু বা ৪ ক্রোশের ন্যূনায়তন অকৃত্রিম জলাশয় এবং প্রস্রবণ অর্থাৎ উৎস বা ঝরণা এই সমস্ত জলাশয়ে স্নান করা বিধেয় (২)। এইরূপ জলাশয়ে স্নান করা যে স্বাস্থ্যসংরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

অপর, পর-খাতোদকে স্নানকালে তীরে মৃৎপিণ্ডোৎক্ষেপণ, সর্ব্বত্র স্নানকালে তীর্থকল্পনা প্রভৃতি স্নানকালে অনুষ্ঠেয় কতিপয় কর্ম্ম আছে; তাহাদের মূলে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না সন্দেহ। স্নানান্তর-কর্ত্তব্য তিলক তর্পণাদির বিষয় প্রাতঃস্নান সমালোচন

(১) পীড়া বা অন্য কোন কারণ বশতঃ উষ্ণজলে স্নানাদি এতদ্দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না।

(২) নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ॥
মনুসংহিতা ৪। ২০৩।

স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের বিষয় উপনয়ন-সমালোচন স্থলে বিবৃত হইবে।

অনন্তর দেবপূজন। স্নানান্তে ধৌতবস্ত্র পরিহিত হইয়া একান্ত মনে ইষ্টদেবতার পূজা-অর্চনায় নিযুক্ত হইবার বিধান (১)। স্নান ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন বহিঃশুদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই বহিঃশুদ্ধির ফল যে মনে ও সংক্রামিত হয়, পূর্ব্বে তাহা উপপন্ন হইয়াছে। সুতরাং স্নানান্তে যখন মন পরিশুদ্ধ হয় তখন ইষ্টদেবতার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলে যে পূজার প্রকৃত লক্ষ্য অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে, পূজার্থ যে সমস্ত উপকরণ ব্যবস্থিত হইয়াছে; তাহাদের উপযোগিতা অতি অপূর্ব্ব। পূজোপকরণ সমূহের মধ্যে পুষ্প, চন্দন, তুলসীপত্র প্রভৃতির স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে যথেষ্ট কার্য্যকারিতা আছে। পুষ্প মধ্যে সাধারণতঃ শ্বেত পুষ্পই যে বাঞ্ছনীয় এবং তাহার যে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, তাহা দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য সমালোচন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তুলসীপত্র এবং বিল্বপত্র প্রভৃতি যে মানব শরীর সম্বন্ধে বিশেষ উপকারিতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুবিধ ঔষধের অনুপান ও সহপানরূপে

---

(১) এইরূপ পূজার ধর্ম্মনৈতিক উপযোগিতা আছে কি না তাহা ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচ্য। এস্থলে আমরা শুধু ইহার স্বাস্থ্যনৈতিক উপযোগিতাই প্রদর্শন করিব।

গ উহাদের নির্য্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে। উক্ত উভয় পত্রের বিশেষতঃ তুলসীপত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ হিতকারিতা দেখিয়াই শাস্ত্রকারগণ পূজার্থ উহাদিগকে উপকরণরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তুলসীপত্র সম্বন্ধে পুরাণশাস্ত্রে এতদূর পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে যে, উহা (তুলসীপত্র) দুঃখ, পাপ এবং রোগ এই তিনেরই শান্তি করিয়া থাকে (১)। যে ব্যক্তি তুলসী পাইয়াও বিষ্ণু পূজায় তাহা প্রদান না করে, তাহার সেই পূজা শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক গৃহীত হয় না (২); এবং যিনি তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন (৩)। তুলসীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক শাস্ত্রীয় বর্ণনা আছে। তৎসমস্তের মধ্যেও যে উহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপযোগিতাই নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) দুঃখাদর্শন্তি দুঃখানি ধাত্রী হরন্তি পাতকং।
রোগিণস্তুলসী হরেদ্দোষং তুলসী হরতেত্রয়ং॥
আগমপুরাণ।

(২) তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চ্চনং।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্লামি ন পূজাং প্রতিবার্ষিকং॥
ভাঃ পুরাণ।

(৩) তুলসী পত্র আদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

বাস্তবিক, কোন প্রকারে উহার অণুকণিকা শরীরে লব্ধ-প্রবেশ হইলে যে অবস্থাবিশেষে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে তাহা নিশ্চিত। উহার আশ্চর্য্য সঞ্জীবনী-শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে :--

কোন স্থানে একটী অসহায় ব্যক্তির কাল পূর্ণ হয়। তাহার বন্ধু বান্ধব এমন কেহই নিকটে ছিল না যে অগ্নিসংস্কারে তাহার মৃতদেহকে সংস্কৃত করে; তাই তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু, দৈবানুগ্রহে তথায় কতকগুলি তুলসী বৃক্ষ ছিল; ঐ তুলসী বৃক্ষসমূহের অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে শবের শরীর চেতনা লাভ করিল, সে জীবন পাইয়া উঠিয়া বসিল। তখন বহু সন্ধানে অবধারিত হইল তুলসী বৃক্ষই তাহার এ পুন-র্জীবনের মূল। তখন হইতেই বিধান হইল মৃতের শিরোদেশে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবার এবং তদবধিই সেই বিধান সমগ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইল এবং অদ্যাপি তাহা প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রবাদ বাক্য হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইতে পারি যে, বাস্তবিক ঐ দেহ গতাসু হইয়াছিল না, তবে উহার জীবনী শক্তি এতই শিথিল হইয়াছিল যে, কেহ তৎকালে তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। অনন্তর, অবস্থা বিশেষের আনুকূল্যে তুলসী কর্ত্তৃক তাহার সেই মূর্চ্ছাভাব বিদূরিত হয় সুতরাং সে আরোগ্য লাভ করে। বাস্তবিক, তুলসীর যে মানব

…সীর সম্বন্ধে বিশেষ উপকারিতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনাতন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। শুনা যায় কোন কোন আমেরিকা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত তুলসীর ম্যালেরিয়া নিবারক গুণ আছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাহা হউক, ঈদৃশ গুণযুক্ত তুলসী পত্রাদি পূজার্থ ব্যবহৃত হওয়াতে যে অজ্ঞাতসারে পূজাকারী তাহার উপকারিতা লাভ করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বিশেষতঃ স্পর্শেন্দ্রিয় সংযোগে উহার গুণসমস্ত শরীরস্থ হইয়া জীবনী শক্তির বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। যাহা হউক, পূজার্থ এই যে সমস্ত পুষ্প পত্রাদির ব্যবস্থা, ইহাতেই সত্যের বৈজ্ঞানিক উচ্চ ধারণা বিশেষরূপে নাই, আরও যথেষ্ট রহিয়াছে। সীমা। এখন তাহাই প্রদর্শন করিব।

পূজার্থ যে সমস্ত পুষ্প ও পত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া লইতে হয়। চন্দন, বিশেষতঃ শ্বেত চন্দন অতি উপাদেয় পদার্থ। উহার গন্ধ অতি আরামদায়ক এবং সুমিষ্ট। সুগন্ধ দ্রব্যের যে রক্তবিশোধন শক্তি আছে তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈদৃশ সুগন্ধ চন্দনে বিলেপিত হইয়া উল্লিখিত পুষ্প পত্রাদির যে স্বাস্থ্য-বিধায়িনী শক্তি আরও কার্য্যকরী হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

উপর, সুগন্ধি কুসুমনিচয় যখন সুগন্ধি শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া মনোরম সৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে, ঘৃতসংযুক্ত ধূপ এবং গুগ্‌গুলাদির (১) মনোহর গন্ধ উহার সহিত মিলিত হইয়া যখন ঐ মনোরম সৌরভের মনোহারিত্ব আরও বৃদ্ধি করিতে থাকে, তখন কি এক আশ্চর্য্য ভাবের আবির্ভাব হয়, মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা যিনি হৃদয়স্থ না করিয়াছেন তাঁহাকে সহসা বুঝান সম্ভবপর নহে। ঐ আশ্চর্য্য ভাবের এবং আনন্দের আবেশে পূজকের মন বিভোর হইয়া উঠে, ভাবমদে মাতোয়ারা হইয়া যান, তিনি তগতচিত্তে এবং প্রফুল্লহৃদয়ে অভীষ্ট দেবের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হন।

এই যে ধূপের বিষয় উল্লিখিত হইল, শাস্ত্রকারগণ শুধু ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করেন নাই; ইহার সহিত আরও নানাবিধ সুগন্ধি এবং উপকারজনক বস্তুর সংমিশ্রণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই নিমিত্তই পঞ্চাঙ্গ, ষষ্ঠাঙ্গ অষ্টাঙ্গ, দশাঙ্গ, দ্বাদশাঙ্গ এমন কি ষোড়শাঙ্গ পর্য্যন্ত ধূপের নামকরণ হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

---

(১) পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি ধূপঞ্চ ঘৃতসংযুতং।
গুগ্‌গুলং কুন্দুরুকং চৈব দেবদারু তুরুষ্ককং॥
সিহ্লকং চন্দনং কাষ্ঠং শ্রীবাসং চাগুরুং তথা।
ধূপদ্রব্যাণি নবং ... দেবে নিবেদয়েচ্চ কর্ম্মণি
বহ্নি পুরাণ

ধূপের সহিত অন্যান্য বহুবিধ গন্ধ দ্রব্যের সংমিশ্রণে উহার মনোহারিত্ব এবং উপকারিতা যে আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্যই পঞ্চাঙ্গাদি অন্যান্যবিশিষ্ট ধূপের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু পূজায় ষোড়শাঙ্গ ধূপ প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১)। চন্দন কুঙ্কুমাদির মনোহর গন্ধের সহিত সুধু ধূপের গন্ধ মিলিত হইলেই কেমন এক প্রমত্তকর ভাব উপস্থিত হয় সকলেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। আর ধূপের সহিত নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য সম্মিলিত হইলে উহার প্রমোদিনী শক্তি যে মনকে আরও মুগ্ধ করিয়া তুলিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং এইরূপ মোহকরী শক্তির প্রভাবে হৃদয় যে সহজেই একাগ্র হইয়া লক্ষ্য সংসাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে তাহাতেই বা বিচিত্র কি?

পূজা পদ্ধতির এবং পূজোপকরণ সমূহের সহিত স্বাস্থ্যের কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই পূজাকার্য্য স্নানের পরে ব্যবস্থিত

(১) গুগ্গুলং শল্লকীজং কুষ্ঠং কর্পূরং মলয়োদ্ভবং।
দেবদারু জটামাংসী জাতী কোষক বালকং॥
মুরামাংসী গুরুচন্দনং গুড়ত্বচং কেশরং।
এলাতথা তেজপত্রং সর্জ্জরসং মৃগনাভিকং॥
ধূপোহয়ং ষোড়শাঙ্গঃ স্যাৎ গোবিন্দ প্রীতিকারকঃ।
শব্দকল্পদ্রুম।

হওয়াতে যে মনস্তুষ্টির বিশেষ উদ্বোধ জন্মে এবং তজ্জন্য পূজার প্রকৃত লক্ষ্য ও বহু পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহাও উক্ত হইয়াছে। এখন আমরা এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

স্নানকালে গাত্র মার্জ্জন, সন্তরণাদি দ্বারা রক্তস্রোতঃ অপেক্ষাকৃত প্রবলতরভাবে ত্বগভিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং আভ্যন্তরিক যন্ত্রনিচয়ে রক্তের মাত্রা ন্যূনতর হয়। রক্তই সমস্ত অঙ্গের বলবিধায়ক। যখন পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রসমূহে সেই রক্তের মাত্রা ন্যূনতর হয় তখন যে তাহাদের স্বাভাবিক শক্তির অনেক লাঘব হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন স্নানকালে শরীরে যে শৈত্য স্পর্শ হয় তাহার প্রভাবে ত্বক্ হইতে রক্তরাশি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। যে স্থলে স্নানকালে গাত্র মার্জ্জন, কি অন্য কোনরূপ অঙ্গ সঞ্চালন না করা হয় তথায় এই কথা সংলগ্ন হইতে পারে; কিন্তু স্নানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে এইরূপ সন্দেহ আসিতে পারে না। স্নানের উদ্দেশ্য বিচারের মধ্যে শরীরের মলাপকর্ষণ প্রধানতম। মলাপকর্ষণ করিতে হইলেই গাত্র মার্জ্জন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, সুতরাং ত্বকের উপর ঘর্ষণ পড়াতে তাহার দিকে, রক্তের গতি না হইয়া পারে না। যাহা হউক, স্নানের

প্রকৃত লক্ষ্য মনে রাখিয়া ... যে রক্তের গতি বহির্মুখীন হইবে সুতরাং ... রক্তের ন্যূনতা বশতঃ তাহাদের স্বাভাবিক বলের হ্রাস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ... যে যন্ত্রের স্বাভাবিক বলের হ্রাস হয় তখন সে তাহার নিরূপিত কার্য্য কখনই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব স্নানান্তর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্বক্ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত প্রত্যাহৃত হইয়া পাকস্থলী ও অন্যান্য পাচক যন্ত্রের স্বাভাবিক বল পুনঃ প্রদান না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। রক্তের ঐরূপ প্রত্যাবর্ত্তনে ন্যূনাধিক এক ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হয়। অতএব স্নানান্তে ন্যূনাধিক এক ঘণ্টা কাল অতীত না হইলে আহার করা অবৈধ। এই এক ঘণ্টা কাল যদি কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা যায়, তাহাহইলে শুধু যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথই প্রশস্ততর হয় তাহা নহে, পরিপাক যন্ত্রসমূহও সাম্যাবস্থ হইয়া স্বস্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। স্নানান্তে পূজা আহ্নিকের ব্যবস্থা থাকাতে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সহজে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আজ কাল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বোধে পূজা আহ্নিকের প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, অথচ তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য তাদৃশ অন্য কোন অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হইতেছে না। ইহার ফল এই হইতেছে যে, স্নানান্তে অন্য কোন উপলক্ষের অভাবে

সকলে এমনি অত্যাহার করিতে থাকেন, এবং এইরূপে দুর্ব্বল পাকস্থলীকে গুরুতর কার্য্যভারে প্রপীড়িত করিয়া অজীর্ণাদি রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

পূজান্তে পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণের উপদেশ আছে। ইষ্টদেবতার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন ব্যতীত এইরূপ বিধানের আর কোন উপযোগিতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য।

বলিবৈশ্বদেব কর্ম্ম।

পূজা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্ম শেষ হইলে আহার করিবার বিধান। কিন্তু আর্য্যপুরুষ শুধু আপনার এবং পরিবার বর্গের উদর-পূর্ত্তিতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার পবিত্র হৃদয় স্বার্থপর নহে, উহা পরার্থপর। উহা শুধু আপনার এবং পরিজনবর্গের সঙ্কীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; উহা অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কোটী জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য লালায়িত। সত্য বটে, মনুষ্য প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় সে এক অগণ্য জলবুদ্ বুদ—সুবিস্তীর্ণ মরুভূমে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা। কিন্তু, তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র নহে। উহা স্থিতিস্থাপক গুণোপেত ব্রহ্মাণ্ড। উহার

প্রসর যতই বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর ততই বৃদ্ধি করিতে পারিবে। পরিশেষে দেখিবে, উহা এমনি বিশ্ব-ব্যাপী আয়তন ধারণ করিয়াছে যে, একটী একটী করিয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত জীবজন্তুর জন্য উহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে—বিশ্বসংসারের প্রত্যেক প্রাণী তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া উহার প্রেমবারি পাণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু, সংসারে ঈদৃশ দেবহৃদয় কাহার? কোন্ হৃদয় বাস্তবিক পরার্থপর হইয়া সকলের জন্য প্রেমধারা সিঞ্চন করিতে সমর্থ? কখনও কি এই স্বার্থান্ধ জগতে এমন বিশ্বপ্রেমিক হৃদয়ের অনু-সন্ধান করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তবে একবার সত্যানুসন্ধায়ি-চক্ষুতে আর্য্যপুরুষের দেবহৃদয়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। দেখিবে—উহা অন্তর্জলোৎসের ন্যায় অবিরাম বেগে সহস্রধারে জগতের দিকে প্রেম-ধারা বর্ষণ করিতেছে। দেখিবে—উহা পরমপূজার্হ দেবনিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটানু পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে আপনার প্রেমবারি সিঞ্চন করি-তেছে।

আর্য্যগণ আহার গ্রহণের পূর্ব্বে বিশ্বদেব এবং ভূত-গণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতেন। এইরূপ বলিপ্রদান বা খাদ্যোৎসর্গের নাম "বলি বৈশ্বদেব কর্ম্ম।" বলিবৈশ্ব-দেব কর্ম্ম গৃহস্থদিগের পঞ্চমহাযজ্ঞাত্মক নিত্যকর্ম্মের অন্যতম এবং তথায় ইহা "ভূতযজ্ঞ" নামে অভিহিত

হইয়াছে (১)। বিশ্বদেব গণদেবতাগণের অন্যতম (২)। এই রূপ দেবকল্পনা যে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-পিপাসুহৃদয়ের সরল আবেগের ফল তাহা আমরা এস্থলে সপ্রমাণ করিতে বসি নাই। আমরা এতদ্দ্বারা এই মাত্র সপ্রমাণ করিতে চাই যে,আহার গ্রহণ কালে হিন্দুহৃদয় দেবোদ্দেশ্যে অন্নোৎসর্গ না করিয়া আপনি আহার করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ রূপ কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে অন্নাদির উৎসর্গে যে ভ্রমাত্মক সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহার যে কোন বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা থাকা সম্ভবপর নহে তাহা অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। কিন্তু, উহা যে হিন্দুহৃদয়ের উদারতার এবং ধর্ম্মভাবপ্রবণতার সাক্ষ্যদান করিতেছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে।

অনন্তর ভূতবলি। ভূতবলি অর্থ জীবগণের উদ্দেশ্যে

---

(১) ব্রহ্ম যজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দৈব যজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(২) হিন্দুশাস্ত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যানুযায়ী নয় শ্রেণীস্থ দেবগণ গণদেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।

১।	আদিত্য	১২।	৬।	অনিল	৪৯।
২।	বিশ্ব	১০।	৭।	মহারাজিক	২২০।
৩।	বসু	৮।	৮।	সাধ্য	১২।
৪।	তুষিত	৩৬।	৯।	রুদ্র	১১।
৫।	আভাস্বর	৬৪।			
					৪২২

(ক) এতন্মধ্যে দশ বিশ্বদেব যথা—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃত, কুরু, পুরুরবা, এবং মাদ্রব।

খাদ্যোৎসর্গ। অনন্ত বিশ্বে অনন্তজীব ক্ষুৎপিপাসায় খাদ্য পানীয়ের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ, আর এক ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্রতর প্রকাষ্ঠে একটী হিন্দুতনয় আপনার যৎসামান্য খাদ্য তাহাদের সমস্তের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছেন এবং তাহাতেই সকলকে পরিতৃপ্ত হইতে বলিতেছেন একি সামান্য কৌতুককর রহস্য ? কুসংস্কার এবং ভ্রম কি ইহার ও উর্দ্ধসীমায় উঠিতে পারে ? আর সেই যে উৎসর্গ তাও কি নাম মাত্রে নয় ? এই নামমাত্র খাদ্যের উৎসর্গে অনন্ত কোটিজীবের ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হইবে ইহা কি ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত কুসংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নহে ?

সত্যবটে এইরূপ খাদ্যদান দান শব্দের বিষয়ীভূত হইবারও যোগ্য নহে ; সত্য বটে উহাতে সুদূরস্থিত জীবনিচয়ের কাহার ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বিহিত হয় না ; সত্য বটে উহাতে সমস্ত জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তির আশা করা ঘোর বিড়ম্বনার বিষয় ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহাও স্বীকার করিব যে, ঐ সামান্য দানে সম্মুখস্থিত পিপীলিকা কি তাদৃশ অন্যান্য কীটদিগেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে না ? ঐ প্রদত্ত অন্ন নিতান্ত অল্প হউক, নখাগ্রমেয় হউক—তথাপি কি উহা শতসহস্র কীটের ক্ষুধাশান্তির পক্ষে প্রচুর হইতে পারে না ? যদি তাহা হওয়া সম্ভবপর হয় তবে ঐ রূপ খাদ্যদানকে নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কার বা একান্ত অনর্থক বলিব কেন ? পক্ষান্তরে দেখ, ঐ রূপ খাদ্যোৎসর্গ কেমন উদারতা এবং বিশ্বজনীন

ভাব প্রকটিত করিতেছে! যখন শুনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু অন্নগ্রাস হস্তে লইয়া দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সমস্ত ভূতগণকে সম্বোধন করিয়া নিষ্ঠা সহকারে কহিতেছেনঃ—"হে বুভুক্ষিত ভূতগণ! যাহারা আমার অন্ন গ্রহণে ইচ্ছাকর তাহারা মৎপ্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত এবং সুখী হও;" যখন শুনি তিনি করুণ হৃদয়ে মাতৃপিতৃ বিহীন—বন্ধু বান্ধব শূন্য—অন্নভিখারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনঃ—"হে দয়ার্হ ক্ষুৎপিপাসাতুর জনগণ! তোমরা এই মৎপ্রদত্ত ভূমিদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধার এবং দুঃখের শান্তি কর;" যখন শুনি সমগ্রভূতগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি পুনরপি ঐ রূপ অন্নগ্রাস গ্রহণ করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিতে আহ্বান করিতেছেন (১); তখন এই অন্তঃকরণ আপনি বলিয়া উঠে—ঐ হৃদয় কেমন সার্ব্বভৌমিক! কেমন বিশ্বপ্রেমিক! উহার প্রেম কেমন সুধা-

(১) দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধা সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচা স্তরবো সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়াপ্রদত্তং॥
পিপীলিকা কীট পতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধ বদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥
যেষাং নমাতা নপিতা নবন্ধু র্নৈ বান্যসিদ্ধি র্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোহন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূত নিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণোহপি যত্র তত্রস্থিতা যেঽখিল ভূতসংঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়াপ্রদত্তং তেষামিদন্তে মুদিতা ভবন্তু॥

আচার রত্নাক।

করের বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় জগৎ ছাইয়া চলে! এটী আপন, ওটী পর, এইরূপ সঙ্কীর্ণতা ঐ দেবহৃদয়ের সীমারেখা হইতেও কেমন সুদূরে অবস্থান করে! বাস্তবিক, যে হৃদয় প্রকৃত বিশ্ব-প্রেমিক নয়—যে হৃদয় সুধু জিহ্বাগ্রেই আপনার উদারতার পরিচয় প্রদান করে তাহা হইতে কখনও ঐ রূপ বিশ্বজনীন উদার ভাব সমুচ্চারিত হইতে পারে না।

অতিথি লাভার্থ প্রতীক্ষা।

বিশ্বদেব এবং ভূতগণের উদ্দেশ্যে খাদ্যোৎসর্গ শেষ হইলেও আর্য্যপুরুষ অমনি আহার করিবেন না; তাঁহাকে তৎপর ও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাকে অন্যূন গোদোহকাল অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিথি লাভার্থ প্রতীক্ষা করিতে হইবে (১)। যদি সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় মধ্যে অতিথির শুভাগমন হয় তাহা হইলে তিনি সমুচিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও সৎকার করিয়া পরে আপনি আহার করিবেন (২)। পাছে সমাগত অতিথি নীচজাতীয় বা অন্য কোন কারণবশতঃ কোন-

---

(১) ততো গোদোহ মাত্রন্তু কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গনে।
অতিথি গ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া॥

বিষ্ণুপুরাণ।

(২) পঞ্চমেচ তথা ভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।
দেবপিতৃ মনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে॥
সংবিভাগং ততঃকৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ॥

আচার রত্নাকরধৃত দক্ষবচন।

রূপ অশ্রদ্ধার পাত্র হন, পাছে তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধার ব্যাঘাত জন্মে, এই নিমিত্ত তিনি, অতিথির নাম, কুল, বাসস্থান প্রভৃতি পরিচয়সূচক কোন কথা কিম্বা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না (১)। অতিথি ধনী নির্দ্ধন, বিদ্বান্, মূর্খ, উচ্চবংশোদ্ভব সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা সামান্য বংশজাত হেয় ব্যক্তি—যেরূপই কেন না হউন, তিনি তাঁহারই প্রতি সমুচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন— অভেদ জ্ঞানে তাঁহারই সংকার করিবেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি শাতাতপ বলেনঃ—অতিথির সম্বন্ধে প্রিয়দ্বেষ্যভেদে সৎকারের তারতম্য করিবে না; অতিথি যদি বেদজ্ঞানহীন এবং পাতিত্যাদি গুরুতর দোষগ্রস্তও হন তথাপি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। প্রত্যুতঃ, তাঁহাকে দুস্তর সংসারার্ণব হইতে স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা ও সৎকার করিবে (২)। শান্তিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঃ—শত্রুও যদি অতিথিরূপে গৃহে সমুপস্থিত হয় তাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না। প্রত্যুতঃ, বৃক্ষ যেমন অম্লান বদনে ছেদকের শিরোপরেও আপনার শান্তিপ্রদ ছায়া বিতরণ করে—গৃহিজনও তেমনি শত্রুর সমস্ত দোষ

(১) দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোহন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং নগচ্ছতি॥

স্মৃতি।

(২) প্রিয়োবা যদিবা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পতিত এববা।
সংপ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥

বিস্মৃত হইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করিবেন (১)। মহর্ষি পরাশর ইহাপেক্ষাও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন; তিনি বলেনঃ—অতিথি যদি ঘোর পাপাত্মা, এমনকি পিতৃহত্যাও ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতকগ্রস্তও হন তথাপি তাঁহার সৎকার ও অভ্যর্থনা করিবে; এমন কি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যের দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সংবর্দ্ধনা করিবে (২)। জগদ্বিখ্যাত সংহিতাকার মহর্ষি মনু বলেনঃ—অতিথিসেবায় ধন, যশঃ, আয়ুঃ এবং স্বর্গলাভ হয় (৩)। শাস্ত্রে অতিথি সেবার মাহাত্ম্যসূচক এইরূপ ভূরি ভূরি ফলশ্রুতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে অতিথি-প্রত্যাখ্যানের পাপজনকত্বসূচক শাস্ত্রীয় বিধির ও অভাব নাই। মহর্ষি পরাশর বলেনঃ—যাহার গৃহ হইতে অতিথি অনাহারে প্রত্যাবৃত্ত হন তাহার পিতৃপুরুষগণ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অনাহারে থাকেন (৪)।

---

(১) অরাবপ্যুচিতঃ কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥
মহাভারত।

(২) পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥
পরাশর সংহিতা ১৫২

(৩) ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াৎ অতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং চাতিথি ভোজনং॥
মনুসংহিতা ৩।১০৬।

(৪) অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ॥
পরাশর সংহিতা ১৫২।

মনু বলেনঃ—যিনি রীতিমত পঞ্চাগ্নি হোমরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যিনি কৃষ্যাদি কার্য্যেও প্রাণিহত্যার আশঙ্কা করিয়া সামান্য উঞ্ছ বৃত্তিদ্বারা অতিকষ্টে জীবন-ধারণ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিও যদি সমাগত অতিথির পূজা না করেন, তাহা হইলে সেই সমাগত অতিথি তাঁহার সমস্ত সুকৃতি হরণ করিয়া লন অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারীর পূর্ব্বোপার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয় (১)। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছেঃ—যে ব্যক্তি অতিথিকে অন্নদান না করিয়া আপনি ভোজন করে, কিম্বা যে এমনই উদরপরায়ণ যে, সুধু আপনার নিমিত্তই রন্ধন করে, সে পাপ ভোজন করে অর্থাৎ এই-

(ক) অতিথি প্রত্যাখ্যানের ফল সকল সময়ের জন্য সমান নহে ; স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ—দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎপাতকং ভবেৎ। তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যান্তবিমুখে গতে ॥ অর্থাৎ দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাপ হয়, রাত্রিতে তাহার অষ্টগুণ হইয়া থাকে। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি তাহা সহজবুদ্ধিরও অধিগম্য।

(১) শিলানপুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ।
সর্ব্বং সুকৃত মাদত্তে ব্রাহ্মণো নার্চ্চিতো বসন্ ॥

মনুসংহিতা ৩।১০০।

এস্থলে যদিও সর্ব্ববর্ণাত্মক "অতিথি" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া এক বর্ণাত্মক "ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি উহাকে অতিথিপর মনে করাতে বিশেষ আপত্তির কারণ দেখা যায় না। কেননা, এস্থলে ব্রাহ্মণও অতিথিরূপেই অভ্যাগত।

রূপ ভোজনদ্বারা সে পাপভাগী হইয়া থাকে (১)। অতিথি প্রত্যাখ্যানে এইরূপ নানাবিধ দোষশ্রুতিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অতিথিসৎকার সম্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ ফল ও দোষশ্রুতির উল্লেখের ও একমাত্র তাৎপর্য্য কেবল জনসাধারণকে অতিথি সৎকারে নিরত করা। পরন্তু, শাস্ত্রকারগণ শুধু প্রলোভন এবং ভীতি প্রদর্শনেও নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা অতিথি সেবাকে গৃহস্থদিগের নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিয়া সকলের পক্ষেই উহা বাধ্যকর রূপে বিহিত করিয়া গিয়াছেন (২)।

আমরা অতিথি সৎকারের যে সমস্ত ফলশ্রুতির এবং অতিথি প্রত্যাখ্যানের যে সমস্ত দোষশ্রুতির উল্লেখ করিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, প্রাচীন কালীয় আর্য্য সমাজে আতিথেয়তার ভাব প্রবলরূপে বর্ত্তমান ছিল। আমরা সুধু অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ বলিতেছি না, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার শতশত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে অন্যান্য শিক্ষিতব্য বিষয়ের ন্যায় অতিথিসৎকার

---

(১) স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে চাতিথিং বিনা।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্ম কারণাৎ॥

আচার রত্নাকর।

(২) ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দৈবযজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পাদ্মে ক্রিয়াযোগ সারে ষোড়শাধ্যায়ে।

সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করা হইত অর্থাৎ অতিথির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ও রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। এই অতিথিসৎকার স্নধু গৃহিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ফলমূলাহারী পর্ণকুটীর বাসী ঋষিদিগের মধ্যেও উহা অনুসৃত হইত—তাঁহারাও অভ্যাগতকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিতেন। ফল কথা এই যে, তৎকালে আর্য্য সমাজে আতিথেয়তা একটী নিত্যানুষ্ঠেয় এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য বলিয়া সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল। এস্থলে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে—অতিথিসৎকার ব্যয়সাপেক্ষ; যিনি ধনী, যাঁহার গৃহে অনবরত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্যাদির সংস্থান থাকে, নিয়মিতরূপে অতিথিসৎকার তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। নচেৎ, যে দরিদ্র—স্বকীয় উদরান্নের সংস্থান ও যাহার ভাগ্যে দুর্ঘট—অতিথিসৎকাররূপ ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভবে? মহামনস্বী শাস্ত্রকারগণ ইহার ও মীমাংসা অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই। এরূপ ব্যক্তির পক্ষেও যাহাতে অতিথিসৎকার সম্ভবপর হইতে পারে তাঁহারা তাহার ও উপায় উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই রূপ জনগণের সম্বন্ধেই বলিয়া গিয়াছেন যে, সমুচিত সংবর্দ্ধনা সহকারে অতিথিকে যদি বিশ্রামার্থ একটুকু স্থান, উপবেশনার্থ তৃণ নির্ম্মিত একখানি যৎসামান্য আসন, এবং পাদপ্রক্ষালনার্থ একটুকু জলমাত্রও দেওয়া যায় এবং মধুরবাক্যে

তাঁহার অভ্যর্থনা করা যায় তাহা হইলেও অতিথি সংকারের ফল লাভ হইতে পারে (১)। স্থূলকথা, যিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন—যাঁহার যে পরিমিত ক্ষমতা—তাঁহাকে সেই অবস্থামতেই—সেই ক্ষমতানুযায়ী ভাবেই অতিথি সংকার করিতে হইবে।

যতদূর উল্লিখিত হইল তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য সমাজে অতিথি সংকার একান্তই ধর্ম্ম্য এবং প্রতিপাল্য কার্য্য বলিয়া সাধারণে প্রচলিত ছিল। ফলতঃ উহা ধর্ম্মবন্ধনে এতদূর বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অতিথি প্রত্যাখ্যানে মহাপাতক সঞ্জাত হয় এবং অতিথি প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোন অভিসম্পাত করিলে তাহা একান্তই ফলপ্রসূ হয় বলিয়া হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করা হইত। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :—পাপমতি দুর্য্যোধন নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়াও যখন ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে আশানুরূপ বিপদাপন্ন কিংবা প্রাণে নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন কৌশলক্রমে কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অসময়ে ষষ্টি-সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের তদানীন্তন অরণ্যাশ্রমে প্রেরণ করিলেন। ভাবিলেন—এখন পাণ্ডবগণের আহারাদি সমাপন হইয়াছে, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই,

(১) তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

মনু ৩।১০১।

সুতরাং অতিথি সৎকার করিতে তাঁহারা সর্ব্বথা অসমর্থ হইবেন এবং তাহা হইলেই "অক্ষান্তি-সার-সর্ব্বস্ব" মহর্ষি দুর্ব্বাসা সশিষ্য আপনাকে প্রত্যাখ্যাত সুতরাং অপমানিত মনে করিয়া পাণ্ডবগণকে দারুণ অভিসম্পাত করিবেন এবং সেই অভিসম্পাতে পাণ্ডবগণ হয় ভস্মীভূত না হয় ঘোর বিপদাপন্ন হইবেন। এ দিকে, মহর্ষি শিষ্যসমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া অতিথি সৎকার যাচ্ঞা করিলেন। পাণ্ডবগণ ঈদৃশ অসময়ে অকস্মাৎ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে এই রূপ সশিষ্য অতিথিরূপে সমুপস্থিত দেখিয়া একেবারে ভীতিবিহ্বল হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—এবার আর রক্ষা নাই; যখন গৃহে কিছুমাত্র অন্নের সংস্থান নাই, তখন বহুশিষ্যপরিবৃত মুনি-পুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে কিরূপে সৎকৃত করিব? আরও ভাবিলেন—মহর্ষি যেরূপ কোপন-স্বভাব, যেরূপ সামান্য অপরাধ পাইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন, তাহাতে এই অতিথি-প্রত্যাখ্যানরূপ গুরুতর অপরাধের জন্য না জানি কতই রাগান্ধ হন—না জানি কি দারুণ অভিসম্পাতেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুল হৃদয়ে বিপত্তারণ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবানের সিংহাসন টলিল, তিনি অমনি তাঁহাদিগের সমক্ষে উপনীত হইলেন এবং কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু বা বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, অতিথিসৎকার আর্য্য-সমাজে একটী অতি প্রধান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহার অকরণে ঘোর পাপ এবং অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস করা হইত।

এস্থলে একটী সন্দেহের নিরসন করা আবশ্যক। আর্য্যসমাজে যখন আতিথেয়তার ঈদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বর্ণিত হইল, তখন স্বভাবতঃই এইরূপ আশঙ্কা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে যে, তৎকালে বুঝি সমাজে অলসতার বড়ই প্রশ্রয় দেওয়া হইত—চেষ্টাবিহীন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদিগের নিশ্চেষ্টতার প্রসর বুঝি আরও বৃদ্ধি করিয়াই দেওয়া হইত। বাস্তবিক, যে সমাজের নীতি-মালায় “ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ” এই নীতিবাক্যটী সাদরে গ্রথিত হইয়াছে, যে সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞাত কুলশীল, অজ্ঞাতনামা, অপরিচিত অতিথিকেও পরম দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবার বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে (১), যে সমাজের ধর্ম্মশাসনে অতিথিকে সকলের গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিবার বিধান স্থান লাভ করিয়াছে (২), সে সমাজে যে অনেকেই অনায়াসলভ্য আতিথ্য গ্রহণে আপনার উদরপূর্ত্তির

(১) স্বাধ্যায় গোত্রচরণ মপৃষ্ট্বাপি তথাকুলং।
হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী॥
বিষ্ণু পুরাণ।

(২) গুরুরগ্নি র্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

চেষ্টা করিবে এরূপ আশঙ্কা অযৌক্তিক নহে। প্রত্যুতঃ, বহুলোকের পক্ষেই আতিথ্য গ্রহণকে একটী ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া সমাজের কুপোষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি করা এবং এইরূপে তাহার অধোগতির পথ প্রশস্ত করা একান্তই সম্ভবপর। কিন্তু,পরিণামদর্শী সুচতুর শাস্ত্রকারগণ এইরূপ অনিষ্টাপাতের বিষয় চিন্তা করিতে এবং তাহা নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে বিস্মৃত হন নাই। বাস্তবিক, তাঁহারা একদিকে যেমন অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি বিনা প্রয়োজনে অতিথিরূপে উপস্থিত হইবার পথেও কণ্টক প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অন্য কথা দূরে থাকুক, অকারণে আতিথ্যগ্রাহী ব্যক্তির পক্ষে নানারূপ পারলৌকিক বিভীষিকা পর্য্যন্তও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কহিয়াছেনঃ—যদি কেহ লোভপরবশ হইয়া বিনা কারণে কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে জন্মান্তরে সেই অন্নদাতার পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি করিয়া থাকে (১)। এইরূপ আরও নানা প্রকার ভীতিবিধায়ক নিষেধ বাক্য দ্বারা অযথা-আতিথ্যের পথ রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, যদি আমরা তর্কের অনুরোধে স্বীকারও করি যে, অতিথিভক্তির ভাব জন-

(১) উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদি দায়িনাং॥
মনু ৩।১০৪।

সাধারণের মনে বদ্ধমূল থাকিলে সমাজে উল্লিখিতরূপ বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবার একান্তই সম্ভাবনা, তাহা হইলেও আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে পারি যে, এই আশঙ্কা বাস্তবিক অধিকাংশ স্থলে আশঙ্কামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় ; প্রকৃত প্রস্তাবে উহার অশুভ ফল অতি অল্পস্থলেই সংঘটিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা কাশীধাম এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানের নামোল্লেখ করিতে পারি। তত্তৎস্থলে পরহিতৈষী ধর্ম্মমতি অনেক রাজা এবং রাজমহিলা অতিথিসৎকারের জন্য বহুসংখ্যক অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তথায় প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে নিত্য নিত্য বহুসংখ্যক অতিথিকে অন্নদান করা হইয়া থাকে। কই, তাহাতে কয়টী লোক বিনা প্রয়োজনে উপস্থিত হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া থাকে? তাহাতে তত্তৎস্থলে সামাজিক কি কি অশুভ সংঘটিত হইয়াছে? বস্তুতঃ, ঐরূপ বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা তর্কমুখে যতদূর গুরুতর বলিয়া প্রতীত হয়, প্রকৃত কার্য্যমুখে কখনই ততদূর নহে। বাস্তবিক, মনুষ্যমাত্রেরই যে একটুকু আত্মমর্য্যাদা আছে—যাহার প্রসাদে সে নীচাদপি নীচ হইলেও ক্রমাগত দশ দিন বিনা প্রয়োজনে অন্যের মুখপ্রেক্ষী হইতে লজ্জাবোধ করে—সেই আত্মমর্য্যাদাই তাহাকে সর্ব্বদা অন্যের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইতে দেয় না—তাহারই প্রভাবে সে, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, আত্মচেষ্টায় নিরত হয় এবং তদ্দারা আপনার

গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় আপনি উদ্ভাবন করিয়া লয়। তবে স্থলবিশেষে যে আতিথেয়তার অতিমাত্র আধিক্য নিবন্ধন কোনরূপ সামাজিক বা পারিবারিক অনিষ্টাপাত না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু, আতিথেয়তার আধিক্য-জনিত ঐ সামান্য অনিষ্টাপাতের সহিত উহার অভাবজনিত গুরুতর এবং বহুবিধ অনিষ্টাপাতের পার্থক্য এত অধিক যে তাহা তুলনার অযোগ্য। বাস্তবিক, তর্কস্থলে যাহাই কেন না বলা হউক, আতিথেয়তা হইতে কখনও কোনও স্থলে অশুভ ফল প্রসূত হইলেও উহা হইতে যে অধিকাংশ স্থলেই নানা রূপ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে, উহার প্রসাদে যে অনেক নিরন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভিখারী প্রাণদান লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতিথিসংকারের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ—অন্নদান। চিন্তা করিয়া দেখিলে অন্নদানের তুল্য দান নাই। ইহ সংসারে যত প্রকার দান সম্ভবপর, কোন দানই অন্নদানের সমকক্ষ হইতে পারে না। তুমি যাহাই কেন দান না কর—মণি মুক্তা হিরণ্য গবাদি যাহাই কেন যত পরিমাণে বিতরণ না কর—কিছুতেই যাচকের মনে তৃপ্তিবিধান করিতে পারিবে না; তুমি যতই দিতে থাকিবে তাহার লালসা রূপ অগ্নি শিখা ততই আরও বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এমন কি, যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া যাচকের করতলে প্রদান কর, তাহাতেও তাহার অতৃপ্ত হৃদয় শান্তিলাভ করিবে না। ভাবিবে—একটীমাত্র ব্রহ্মাণ্ড আমার করতলন্যস্ত হইল,

যদি ঈদৃশ শত শত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান থাকিত এবং তাহার সমস্তটাই এইরূপে আমার করতলন্যস্ত হইত, তাহা হইলে আমি প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারিতাম; তাহা হইলেই আমার এই অতৃপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চিত হইত। হৃদয়ের এই অনন্ত অতৃপ্তির বিষয় জ্বলন্ত রূপে উপলব্ধি করিয়াই মতিমান নৃপকুলচূড়ামণি যযাতি স্বকীয় পুত্র পুরুকে কহিয়াছিলেন:—কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না—প্রত্যুত, ঘৃতাহুতি সংযোগে বহ্নির ন্যায় অভিলষিত বস্তুর উপভোগে আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে (১)। কিন্তু অন্নদানের কথা ইহার বিপরীত। একমাত্র অন্নদান দ্বারাই যাচকের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পার। এক গ্রাসের স্থলে দশ গ্রাস—তাহার স্থলে শত গ্রাস, দান কর—শাকান্নের পরিবর্ত্তে দুগ্ধান্ন, তাহার পরিবর্ত্তে পলান্ন প্রদান কর—তাহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইবে—তৃপ্তির আনন্দময়ী মধুরতা তাহার মুখশ্রীতে শান্তির পবিত্র ছায়া বিভাসিত করিবে, সে তৃপ্ত হইবে। শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্তই কহিয়া গিয়াছেন:—অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠতর দান কখনও ছিল না এবং কখনও হইবে না; উহা পুণ্য, যশঃ, আয়ুঃ, বল এবং পুষ্টিবর্দ্ধন করে;

---

(১) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

মহাভারত।

উহাতে সকলই হয়। যিনি অন্নদান করেন, সুরালয়ে তাঁহার জন্য মণিকাঞ্চনখচিত, অপ্সরগণসেবিত রথরাজি সুসজ্জিত থাকে (১)। বাস্তবিক, অন্নদানের তুল্য দান নাই, সুতরাং অতিথি সৎকারের ন্যায় মঙ্গলপ্রদ ব্যবস্থাও আর নাই বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

আমরা অতিথিসৎকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকিলেও উহার সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নাই ; অতঃপর তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

এই সুবিশাল ভবরঙ্গভূমে জীর্ণকন্থ শাকান্নভোজী দরিদ্র হইতে মণিমাণিক্যভূষিত পলান্নভোজী ধনেশ্বর পর্য্যন্ত যতজন আপনার অংশ অভিনীত করিতেছে, সকলেই অন্যোন্যনির্ভর সাপেক্ষ। কেহই শুধু আপনার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। যে নৃপেশ্বর আপনার গৃহবেষ্টনীতে আপনি সর্ব্বস্ব হইয়া সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তিনিও ঐ পথশ্রান্ত ধূলিধূসরিত পরিব্রাজকের ন্যায় অন্যের উপর নির্ভর সাপেক্ষ। উহাঁকে অন্যের

(১) অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং বলপুষ্টি বিবর্দ্ধনং॥
সর্ব্বমন্নস্য দানেন ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ।
মহাকাঞ্চন চিত্রাণি সেবিতাস্থপসরোগণৈঃ।
অন্নদস্যোপতিষ্ঠন্তি বিমাণানি সুরালয়ে।

সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে দাও, মুহূর্ত্ত মধ্যে উহাঁ-রও রাজসিংহাসন টলিবে, অতুল রাজশ্রী কালিমায় কলঙ্কিত হইবে, সর্ব্বস্ব অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। বাস্তবিক, ইহ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না—সকলকেই অল্প বা অধিক মাত্রায় পরাধীনতার শৃঙ্খল গলদেশে বহন করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, যদি সকলকেই অংশতঃ পরাধীন হইতে হইল, তবে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা পরের সহিত সংঘর্ষ—পরের নিকট গতিবিধি অনিবার্য্য। কাহারও বা দিনে শতবার কাহারও বা দশবার, কাহারও বা অল্পতর বা অধিকতর বার পরের সংঘর্ষে—পরের নিকটে গতিবিধি অপরিহার্য্য। কাহারও বা ঐ রূপ সংঘর্ষে সুদূরদেশে কাহারও বা গৃহপ্রাঙ্গনের অনতিব্যবধানেই গতিবিধি করিয়া স্বস্ব প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু, এই দরিদ্র সংসারে কয়টী লোক আপনার গৃহ বেষ্টনীর চতুঃ-সীমায় নিবদ্ধ রহিয়া আপনার যাবতীয় সাংসারিক অভাব বিদূরণে সমর্থ হইতে পারে? কয়টী লোক ধনৈশ্বর্য্যে এরূপ সৌভাগ্যশালী যে, দূরস্থানে গতিবিধি বন্ধ করিয়া আপনার অভাব আপনি পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইতে পারে? লক্ষ জনের মধ্যে একজনও ঐরূপ সৌভাগ্য-শালী নহেন। তবে এখন ভাবিয়া দেখ—সংসারে কতকোটি মনুজসন্তানের নিরত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে, একদেশ হইতে দেশান্তরে—গমনাগমন করিয়া আপনার এবং

পরিজনবর্গের অভাব পরিপূরণার্থ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়—অনবরত বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র স্বজনবর্গের মধুর সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশে অপরিচিতপূর্ব্ব জনগণের সহানুভূতির ভিখারী হইয়া পথশ্রান্তি এবং ক্ষুৎপিপাসার অপনোদন করিতে হয়। যদি এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আতিথেয়তার পুণ্যদ্বার উন্মুক্ত না থাকে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গৃহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অতিথিসৎকার প্রাপ্তির আশাও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা কেমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি বণিক্, দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পণ্যদ্রব্য লইয়া ক্রয় বিক্রয় করা তোমার ব্যবসায়; যদি তুমি পথিমধ্যে শ্রমাপনোদনযোগ্য সৎকার টুকুও লাভ করিতে না পার, যদি তোমাকে সর্ব্বথা আপনার সঙ্গীয়-যৎসামান্য সম্বল-দ্রব্যের প্রতিই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে তোমার অবস্থা কেমন শোচনীয়, কেমন বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়ে, একবার মনে মনে ভাবিয়া দেখ। এইরূপ বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় অতিথিসৎকারের নিয়ম কেমন বিপন্নিবারক! কেমন মঙ্গলবিধায়ক! সত্য বটে, যে দেশে আতিথেয়তার পুণ্যদ্বার অর্গলবদ্ধ—যথায় অর্থ ব্যতিরেকে দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত জুটিয়া উঠে না, তথায় ও সমাজ চলিতেছে, তথায়ও সমাজ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু, তাই বলিয়া সে দেশের সমাজশরীর

বিকৃত হয় নাই এরূপ বলিতে পারি না। সে দেশের দীন দরিদ্রের অবস্থা ভাবিয়া দেখ—যে দরিদ্র সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত খাটিয়াও উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না, তাহার স্থানান্তরে গমনাগমন জনিত দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া দেখ। তথায় পথপ্রান্তে কত হতভাগা হিমের দারুণ তাড়না ভোগ করিতেছে—ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল তাড়নে হীনাঙ্গ এবং ক্ষুধার শরীরনাশী তাড়নায় অবসন্ন হইয়া করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে, (১). কিন্তু তাহাদের সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণবিবরে প্রবেশপথ না পাইয়া অনন্ত আকাশেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—পবিত্র আর্য্য সমাজে—কয়টী লোক ঐরূপ দুঃসময়ে সাহায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকে ? কয়টী লোক নির্ম্মম পাষাণের ন্যায় বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ শ্রবণে অধীর না হইয়া আপনার মুখে অন্ন গ্রাস তুলিয়া দিয়া থাকে ? এখন যে আর্য্যসমাজ এই ঘোর দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে, এখন যে ইহা রক্তমাংসবিহীন কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি ইহা হইতে আতিথেয়তার পবিত্র ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই ;

(১) ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ প্রভৃতি দেশ অর্থাৎ যে সকল দেশে ধর্ম্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত বহিঃসৌন্দর্য্যপূর্ণ সভ্যতার দৈনন্দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সেই সমস্ত দেশ আমাদের লক্ষ্যস্থানীয়।

এখনও বহু গৃহস্থ অতিথিসৎকারকে একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

আহার।

অতিথিলাভার্থ প্রতীক্ষা এবং অতিথিলাভস্থলে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া আর্য্যপুরুষ আপনি আহার করিবেন। কিন্তু, যাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যও পবিত্রতা-ব্যঞ্জক, যিনি অপবিত্রতাকে সর্ব্বদা নরকবৎ ঘৃণনীয় মনে করেন, তাঁহার পক্ষে আহার গ্রহণ রূপ গুরুতর কার্য্যে অপবিত্র শরীরে যোগদান করা অসম্ভব। তাই তিনি এ সময় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া শুচি শরীরে আহার করিতে বসিবেন। পরম পূজার্হ ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস বলেন :— পঞ্চার্দ্র হইয়া অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখ এই পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া মৌনভাবে আহার করিবে (১)। মহামতি মনু বলেন :—আর্দ্র পদে ভোজন করিবে, কেননা আর্দ্রপদে ভোজনকারী ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া থাকে (২)। এই রূপে হস্ত পদাদি প্রক্ষালনে শরীর

(১) পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাশ্রিতঃ
হস্তৌ পাদৌ তথাচাস্যমেষু পঞ্চার্দ্রতামতাঃ ॥
আচার রত্নাকরধৃত ব্যাস বচন।

(২) আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।
আর্দ্রপাদস্তুভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥
মনুসংহিতা ৪। ৭৬ ॥

পবিত্র বোধ হয়, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রসন্নতা জন্মে। মনের এইরূপ প্রসন্নতার উপর আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাককার্য্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। আজ তুমি প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রসন্ন অন্তঃকরণে একটী দুষ্পাচ্য বস্তুও আহার কর, দেখিতে পাইবে, অনায়াসে তাহা পরিপাক পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, তুমি অপ্রসন্ন হৃদয়ে—ঘৃণা ঘৃণা বোধের সহিত—একটী নিতান্ত লঘুপাক বস্তুও আহার কর, দেখিতে পাইবে, তাহা উত্তমরূপে পরিপাক পায় নাই; হয়ত বমন বা অন্য কোন আকারে উহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই পাকস্থলী হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে। প্রফুল্ল হৃদয়ে আহার করিলে আহারকালে প্রচুর পরিমাণে পাচকধর্ম্মী লালা নিঃসৃত হয়, সুতরাং সহজেই পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু, অপবিত্র বা সঙ্কুচিত মনে আহার করিলে পাচকরস উপযুক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইতে পারে না, তাই পরিপাকের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এই জন্যই—মনের এই প্রসন্নতাসাধন জন্যই—আহারের পূর্ব্বে হস্ত পদাদি প্রক্ষালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। সুধু হস্তপদাদি প্রক্ষালন রূপ বহিঃপ্রক্রিয়ার দ্বারা মনের প্রসন্নতাসাধনের ব্যবস্থা করিয়াও শাস্ত্রকারগণ তৃপ্ত হন নাই, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা দ্বারাও তাহার প্রসন্নতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মনু বলেন :—ভোজন কালে

অন্নের পূজা করিবে, কোন নিন্দাবাদ করিবে না ; দেখিয়া আনন্দিত ও প্রসন্ন হইবে এবং যেন প্রতিদিনই পাই এই বলিয়া অন্নের বন্দনা করিবে। কেননা, অন্ন পূজিত হইলে বলবীর্য্য প্রদান করে, কিন্তু অপূজিত হইলে বলবীর্য্য উভয়ই নাশ করিয়া থাকে (১)। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—অন্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে এবং প্রতি-দিনই যেন অন্ন লাভ হয় এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে (২)। এইরূপ পূজা বন্দনা, পৌত্তলিক পূজা বন্দনা নহে। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল মনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন দ্বারা উহার প্রসন্নতা সংসাধন করা। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ভোজনকালে যে পঞ্চ দেবতার নামে অন্নোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহার মূলেও ঐরূপ মহদুদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল বলিয়া বোধ হয়। অধুনাতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভোজনকালে সকৃতজ্ঞচিত্তে অন্নদাতা ভগবানের অসামান্য দয়ার ভাব স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে

---

(১) পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ ॥
পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদং ॥

মনু ২য়। ৫৪। ৫৫।

(২) অন্নং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েত্ততঃ।
অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতদিতি ভক্ত্যাথ বন্দয়েৎ ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

নমস্কার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যে ভাবেই কেন মনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা না করা যাউক, তদ্দারাই যে তাহার প্রসন্নতা সাধিত হয় এবং তাহাতেই যে প্রাগুক্ত রূপ পরিপাক কার্য্যের সাহায্য হয় তাহা অবাধে স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনন্তর আহারের পদ্ধতি। হিন্দু শাস্ত্রে আহার কালে মৌনাবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর হিত-সাধনোদ্দেশ্যে মহামৌন ভাবে পঞ্চগ্রাস ভোজন করিবে (১)। মহর্ষি ব্যাসোক্ত যে বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ও দৃষ্ট হইতেছে যে, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করাই বিহিত। ব্যাসোক্ত "পঞ্চগ্রাস" শব্দে সম্ভবতঃ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চগ্রাস গ্রহণ পর্য্যন্ত একে-বারেই মৌনাবলম্বন করিতে হইবে, অপরাপর গ্রাস গ্রহণ কালে অগত্যা সামান্যরূপ বাগ্যত হইয়া থাকিলেও হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত বচনে তাদৃশ কোন পার্থক্য প্রদর্শিত হয় নাই, স্থূলভাবে মৌনাবলম্বনের উপ-দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, উভয়েরই উদ্দেশ্য এই যে, আহারকালে সংযত-বাক্ হইবে। এইরূপ মৌনাবলম্বনেব বিশেষ উপ-

(১) অনিন্দং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্ মহামৌনং প্রাণাদি হিতকারণং॥
বিষ্ণুপুরাণ

যোগিতা আছে। মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আহার করিলে পরিমিতাহারের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কেননা, তখন বাগ্‌যন্ত্র বাক্যাড়ম্বরে লিপ্ত না থাকাতে মনের বিষয়ান্তরে প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক হ্রসিত হয়, সুতরাং সহজেই আহার অল্প কি অধিক, কি পরিমিত হইল, এবং উত্তম-রূপে চর্ব্বিত হইল কিনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যায়। আহারের মাত্রার ন্যূনাতিরেক হইলে এবং ভুক্তদ্রব্য যথোপযুক্তরূপে চর্ব্বিত না হইলে যে নানারূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

পংক্তিভোজন।

আর্য্যগণ পংক্তিভোজন করাকে দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন ঃ—তৈলবিন্দু যেমন জলরাশিতে সংক্রমিত হয়, সহভোজন দ্বারা তেমনি পাপ সমস্ত সংক্রমিত হইয়া থাকে (১)। অধিক কি তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে কাহার কি প্রচ্ছন্ন পাপ আছে তাহা যখন জানা দুঃসাধ্য, তখন আত্মীয় স্বজনকে লইয়াও এক পংক্তিতে আহার করা

(১) আসনাচ্ছয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥

পরাশর ১২।৭২।

কর্ত্তব্য নহে (১)। একটুকু বিশদ রূপে বুঝাইতে গেলে ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—কাহারও সহিত এক পংক্তিতে আহার করা কর্ত্তব্য নহে। অসম্পর্কিত অজ্ঞাতস্বভাব, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক্, তাহার শরীরস্থ পাপ বা পীড়া তো প্রচ্ছন্ন থাকিবারই কথা, যাহারা আত্মীয়—যাহাদের প্রতি পদেপদে নির্ভর করিতে হয়, এমন কি যাহাদের সহিত জীবন একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদেরও শরীরে এমন পাপ বা পীড়া থাকিতে পারে যাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব কাহারও সহিত একত্র আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

এইরূপ জগৎ ছাড়া বিধানের কথা—আশ্চর্য্য নিয়মের কথা—শুনিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয় সত্য, কিন্তু, ইহাও নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে—নিতান্ত কুসংস্কারপূর্ণ আড়ম্বর নহে। সত্য বটে, ইহাতে পারিবারিক সংমিশ্রণের ভাব বহু পরিমাণে হ্রসিত হয়, সত্য বটে ইহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসাভাবের কিছু ব্যত্যয় ঘটে, সত্য বটে ইহাতে পরস্পর বাক্যালাপ-জনিত আনন্দ সম্ভোগের অনেকটা ব্যাঘাত হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ঐরূপ বিধানকে একান্ত নিন্দার্হ

(১) অপ্যেক পংক্ত্যানাশ্নীয়াৎ সম্বৃতঃ স্বজনৈরপি।
কোহি জানাতি কিংকস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥
আচার রত্নাকর ধৃত যমবচন।

মনে করা যাইতে পারে না। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মানব শরীরেও তড়িৎ-শক্তি বিদ্যমান আছে। ঘর্ষণ মার্জ্জনাদি দ্বারা যেমন পদার্থ নিচয়ের অভ্যন্তর হইতে তড়িচ্ছক্তির স্ফুরণ হয়—যেমন এক পদার্থ হইতে সন্নিহিত পদার্থান্তরে তাহার সংক্রমণ হয়, তদ্রূপ আহার-কালে মানব শরীরের অভ্যন্তরেও নানাবিধ যান্ত্রিক ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সাধিত হইতে থাকে বলিয়া একের শরীর হইতে তড়িতের স্ফুরণ এবং সন্নিহিত অপরের শরীরে তাহার সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব নহে। ঐ স্ফুরণ এবং সংক্রমণ হয়ত এত সূক্ষ্মাকারে হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কিন্তু যত সূক্ষ্মাকারেই কেন না হউক, যখন তড়িতে আধার-পদার্থের গুণ সংশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ যে গুণবিশিষ্ট পদার্থে তড়িৎ থাকে তাহাতে যখন সেই পদার্থের গুণই সংক্রমিত হয়, তখন উহার সহিত এক শরীর হইতে অপর শরীরে পরস্পরের ভাব-বিনিময় কার্য্য যে কিঃৎ পরিমাণে না হইতে পারে এমন নয় অর্থাৎ একের শরীরের ভাব ঐরূপ সংক্রমণের দ্বারা সন্নিহিত অপরের শরীরে সঞ্চালিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে একবার মনে কর—কাহারও শরীরে কোন রূপ সংক্রামক পীড়া প্রচ্ছন্নাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তুমি তাহার সহিত এক পাত্র কিংবা এক পংক্তিতে আহার করিতে বসিলে, অন্য সময়াপেক্ষা

ঐ সময় তোমাদের শরীরের তড়িৎ স্ফুরণের এবং সংক্রমণের কার্য্যও অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় চলিতে লাগিল, এমত স্থলে তাহার শরীরের ঐ প্রচ্ছন্ন সংক্রামক পীড়া—যত অল্প মাত্রায় কেন না হউক—তোমার শরীরে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারে কিনা। তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে "হাঁ পারে।" যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে পংক্তি-ভোজনকে দোষাবহ মনে করা নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কার হইতে পারে না। যাহা হউক, তথাপি সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা সুধু আশঙ্কামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং পংক্তি-ভোজনে সর্ব্বথা বিরত হইলে মধ্য হইতে একত্র-ভোজন-জনিত প্রাগুক্তরূপ উপকারিতা লাভেই বঞ্চিত থাকিতে হয়। অতএব উহাকে সর্ব্বদা দোষাবহ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভোজনে দিঙ্‌নির্ণয়। আর্য্যগণ আহার কালে দিক্‌ বিবেচনা করিয়া উপবেশন করিতেন। এক এক দিগভিমুখে উপবেশন করিলে এক এক রূপ ফললাভ হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন (১)। এইরূপ দিঙ্‌নির্ব্বাচনের কোনও ফলোপধায়িতা আছে কিনা

(১) আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তেহ্যুদঙ্মুখঃ॥
আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত মনু।

জানিনা। কিন্তু মনুর ন্যায় প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন মনীষির লেখনী হইতে ঐরূপ বিধান নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় উহার মূলেও কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা সুধু আহারের পূর্ব্বক্ষণে এবং আহারকালে করণীয় অনুষ্ঠান বিশেষ। আহার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এপর্যন্ত তৎসম্বন্ধে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। অতঃপর আমরা তাহাই বিবৃত করিব।

আহার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আহারের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু আহারের উদ্দেশ্যাদি বর্ণনা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ীভূত, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন সংস্রব নাই। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, সাধারণতঃ চিকিৎসা শাস্ত্র আহারের যে একমাত্র উদ্দেশ্য শরীরধারণ মনে করিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা করেন না। চিকিৎসা শাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্য শরীর, ধর্ম্মশাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্য আত্মা। চিকিৎসা শাস্ত্র যেখানে শরীর ধারণ এবং শারীরিক কল্যাণ সাধনকেই একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করেন, ধর্ম্ম-শাস্ত্র সেখানে আত্মার ক্রমোন্নতি এবং কল্যাণ বিধানকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকেন। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শরীর রক্ষার জন্য সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে যে নানারূপ

বিধান দৃষ্ট হয় শরীর রক্ষা দ্বারা আত্মার কল্যাণ সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে, যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাসগৃহের সুব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক, তেমনি আত্মার কল্যাণার্থে তাহার বাসগৃহ স্বরূপ শরীরের সমুচিত পুষ্টি-সাধন এবং সংস্করণ আবশ্যক; তাই শরীর রক্ষাকে একটি অতি মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। তবেই দৃষ্ট হইতেছে যে, আর্য্যশাস্ত্রে শরীরের জন্য, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, বিলাস বাসনার চরিতার্থতা জন্য, শরীর ধারণ নয়—আত্মার কল্যাণের জন্য, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমূহের পরিস্ফুটন, পরিবর্দ্ধন এবং ক্রমোন্নয়নের জন্য, শরীর ধারণ। যদি এইরূপই হইল, যদি আত্মার কল্যাণ সংসাধনই আর্য্যশাস্ত্রে শরীর ধারণের চরম লক্ষ্য হইল, তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যেরূপ আহার্য্য গ্রহণে সেই লক্ষ্য সুচারু রূপে সাধিত হইতে পারে, যেরূপ খাদ্য ভোজনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহের যথোচিত স্ফুরণের সহায়তা হইতে পারে, যাহা গ্রহণে পাপ প্রবৃত্তি সমূহের উদ্দীপনার আশঙ্কা তিরোহিত হয়, আর্য্যশাস্ত্রে তদ্রূপ আহার্য্য গ্রহণই ব্যবস্থিত হইয়াছে এবং তদ্বিপরীতধর্ম্মী আহার্য্য গ্রহণ দোষাবহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে (১)।

(১) শরীর এবং আত্মা—শারীর সুখসাধন এবং আত্মার কল্যাণ বর্দ্ধন—ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর, কোন্‌টী কি নিমিত্ত অপরটী অপেক্ষা মহত্তর, এস্থলে তাহার বিচার অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত

বাস্তবিক এই অনুমান ভ্রমাত্মক নহে। আমরা এসম্বন্ধীয় কতিপয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিব।

শাস্ত্রমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণ ত্রয় ভেদে আহার ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যে আহার্য্য গ্রহণে সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয় তাহা সাত্ত্বিক; যাহা ভোজনে রজোগুণের আধিক্য জন্মে তাহা রাজসিক এবং যাহা ভোজনে তমোগুণের বৃদ্ধি হয় তাহা তামসিক। কোন্ গুণপ্রধান ব্যক্তির কোন্‌রূপ খাদ্যে অভিরুচি তাহা নির্দ্ধারণস্থলে গীতায় উক্ত হইয়াছেঃ—যে খাদ্য গ্রহণে আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, অরোগিতা, চিত্তের প্রসন্নতা এবং রুচিবৃদ্ধি হয়, যাহা রস এবং স্নেহগুণ যুক্ত, যাহার ফল চিরস্থায়ী অর্থাৎ যাহা উত্তেজনার পর অবসাদন জন্মায় না এবং যাহা উৎকৃষ্ট এইরূপ খাদ্য সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়। যে খাদ্য অতিকটু, অতিঅম্ল, অতিলবণ, অতিউষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতিরূক্ষ, এবং অতিদাহী এবং যে খাদ্য দুঃখ,

---

হইবে যে, নথাগ্রমেয় দুই চারিটী নাস্তিক বা জড়বাদী ব্যতীত সমস্ত জগৎ একবাক্যে শরীর হইতে আত্মার মহত্ত্ব,গুরুত্ব, এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু শরীর হইতে আত্মার এই মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব আর্য্যজাতি যেমন পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন অন্য কোন জাতি কোনও কালে তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহানুভব সক্রেটিস্ পর্য্যন্ত আত্মার ঐশ্বর্য্যাদি সম্বন্ধে পূজ্য-পাদ ঋষিদিগের ন্যায় জ্বলন্ত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

শোক ও রোগজনক, রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাই ইচ্ছা করিয়া থাকেন এবং যে খাদ্য বহুক্ষণের পক্ক অর্থাৎ যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে, যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র এরূপ খাদ্য তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রিয় (১)। আহারের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ দ্বারাই তাহার শ্রেষ্ঠত্বাদি সূচিত হইতেছে অর্থাৎ সাত্ত্বিক খাদ্য যে উত্তম, রাজসিক খাদ্য যে মধ্যম এবং তামসিক খাদ্য যে অধম তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। এখন কোনরূপ আহার্য্য উক্ত কোন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে সমাজ-প্রচলিত যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, তাহা আমাদের লক্ষ্যও নহে। তবে যথাস্থানে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি খাদ্যের সম্বন্ধে আমরা কিছু মতামত প্রকাশ করিব।

(১) আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রূক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭শ অধ্যায়, ৮।৯।১০ শ্লোক

আহার্য্য দ্বিবিধ—আমিষ এবং নিরামিষ। নানারূপ মৎস্য মাংস এবং পলাণ্ডু প্রভৃতি কতিপয় উদ্ভিজ্জ (১) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং গবাদির দুগ্ধ, নানাবিধ ফল মূল এবং শস্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয় এই যে, নিরামিষ এবং আমিষ ইহার মধ্যে কোন্‌রূপ খাদ্য মানব শরীরে বিশেষ উপযোগী।

এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। কিন্তু, কোনও পণ্ডিতের মতই এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে গৃহীত হয় নাই এবং কখনও যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা অল্প। তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে এইরূপ মনে করিয়া থাকি যে, এ সম্বন্ধে আর্য্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই কালে প্রাধান্য লাভ করিবার একান্ত সম্ভাবনা। আমরা তাঁহাদিগের মতামত সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। প্রথমতঃ আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিয়া গিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক।

আমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারি তাহাতে অনুমান হয় যে, মৎস্য মাংসাদি আহার করা

(১) আমিষ শব্দের অর্থানুসারে যদিও কোনরূপ উদ্ভিজ্জাদি উহার অন্তর্ভূত না হউক, তথাপি পলাণ্ডু প্রভৃতি কতিপয় উদ্ভিজ্জ গুণতঃ আমিষ শ্রেণীর অন্তর্গত হইবার যোগ্য, তাই উহাদিগকে আমিষ খাদ্যের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

কোনও মতে তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না (১)। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নিবর্ত্তক বিধির প্রকাশ্য শাসন বাক্য পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বারাই এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে। মৎস্য শব্দের দুই রূপ বর্ণবিন্যাস আছেঃ—এক মৎস্য; অপর মৎস। প্রথম রূপের ব্যুৎপত্তিগত কোন অর্থ আছে কিনা এবং থাকিলেও তদ্দ্বারা উহার নিষেধাত্মক কোন অর্থ সূচিত হয় কিনা জানিনা। কিন্তু দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ মৎস শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই উহার নিষেধাত্ম-

(১) অতি প্রাচীন কালে আর্য্য সমাজে মাংসাহার অপ্রচলিত ছিল না; প্রত্যুতঃ অনেক সময়ে আগ্রহের সহিত উহা ভক্ষণ করা হইত। এমন কি, যে গোমাংসের নাম শ্রবণে এখন হিন্দু সমাজ শিহরিয়া উঠেন, সুদূর প্রাচীন কালে সমাজে তাহারও প্রচলন ছিল। অনেক সময় অতিথি সমাগত হইলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া গোবৎস বধ করা হইত; এনিমিত্ত অভিধান শাস্ত্রে অতিথি-শব্দ-পর্য্যায়ে গোঘ্ন শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোমেধাদি যজ্ঞেও ঐ সমস্ত পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। কুক্কুট ভক্ষণ ও দোষাবহ ছিল না, তবে গ্রাম্যকুক্কুটের পরিবর্ত্তে বন্যকুক্কুট ব্যবহৃত হইত এইমাত্র। যাহা হউক, আর্য্যগণ যখন আদিম বাসভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করিলেন ঐরূপ খাদ্য সম্ভবতঃ তৎকালে প্রচলিত ছিল। অনন্তর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের পক্ষে মাংস ভক্ষণ, বিশেষতঃ গবাদির অত্যুষ্ণ-ধর্ম্মী মাংস ভক্ষণ একান্তই অকর্ত্তব্য, তখন হইতে তাঁহারা মাংসভক্ষণের, বিশেষতঃ গবাদির মাংসভক্ষণের বিরুদ্ধে নানা রূপ নিষেধাত্মক বিধি প্রচার করিতে লাগিলেন।

কতা সূচিত হয়, উহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ ঃ— মৎ+সঃ-মৎসম্বন্ধীয়ো ভক্ষকঃ সঃ অর্থাৎ আমি যেমন এখন তাহাকে ভক্ষণ করি সেও তেমনি জন্মান্তরে আমাকে ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ তাহাকে ভক্ষণকরা রূপ পাতকের শাস্তি স্বরূপ আমাকে জন্মান্তরে মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে তাহারই সামান্য ভোজ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। মাংস শব্দ সম্বন্ধেও ঐ কথা ঃ— মাং+সঃ—যথাহহং তং অদ্মি তথা সোহপি মাম্ অৎস্যতি অর্থাৎ আমি যেমন এখন তাহাকে ভক্ষণ করি সেও তেমনি পুনর্জ্জন্মে আমাকে ভক্ষণ করিবে (১)। ভাবার্থও ঐরূপ। উভয়ত্রই প্রাণিবধ রূপ পাতকের শাস্তি স্বরূপে ভক্ষিত প্রাণীর ভোজ্য-রূপ-প্রাপ্তি স্বরূপ পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থদ্বারা মৎস্য মাংসাহার একান্তই দোষাবহ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। অপর, নিবর্ত্তক বিধির প্রকাশ্য নিষেধাত্মক বিধান দ্বারাও উহাদের অভক্ষ্যতা প্রকটিত হইয়াছে। মৎস্যভোজন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ঃ—যে ব্যক্তি যাহার মাংস ভোজন করে সে তাহার মাংসাদ নামে কথিত হয়; মৎস্য সমস্ত জন্তুরই মাংস ভক্ষণ করে, অতএব যে মৎস্যাহার করে সে প্রকারান্তরে সমস্ত মাংসই

(১) মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্মহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
মনু ৫।৫৫।

আহার করিয়া থাকে (১)। এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে মৎস্যভোক্তাকে সর্ব্বমাংসভোজী নৃশংস রাক্ষস ভাবাপন্ন বলা হইতেছে। মহর্ষি পরাশর মৎস্যভোজনে দিবা রাত্রি উপবাস রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন (২)। এদিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভগবদুক্তি বলিয়া যে সকল অনুশাসন বাক্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মৎস্য ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, "যে ব্যক্তি মাংসাহার করে সে যেন আমাকে স্পর্শ না করে এবং যে ব্যক্তি মৎস্য আহার করে সে যেন আমাকে স্মরণ (ও) না করে (৩)।" এতদ্দ্বারা মাংসাহার হইতেও মৎস্যাহারের অধিকতর দূষণীয়তা সূচিত হইতেছে। যাহাহউক, তথাপি মাংসাহার সম্বন্ধেই শাস্ত্রে অধিকতর বিচার এবং নিষেধসূচক ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। মনুসংহিতায় মাংস ভক্ষণের প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে ঃ—মাংসের উৎপত্তি অর্থাৎ ভোজনার্থহত জীব

(১) যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
মনু ৫।১৫।

(২) শল্লকী শশক গোধা মৎস্য কূর্ম্মাভিপাতনে।
বৃন্তাক ফল ভোক্তাচ হ্যহোরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি॥
পরাশর ৬।১০।

(৩) মাংসাদো নচ মাংস্পর্শেদ্‌ মৎস্যাদো নচ মাম্‌স্মরেৎ।

যে শুক্রশোণিতরূপ দ্বিবিধ মলের (১) পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এবং বন্ধন ও বধ নিমিত্ত তাহার যে নিদারুণ ক্লেশ হয় তাহা অনুধাবন করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য (২)। মাংস ভক্ষণাপেক্ষা বর্জ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনার্থে উক্ত সংহিতার স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছেঃ—যিনি বৎসর বৎসর অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শতবৎসর যাপন করেন এবং যিনি মাংস ভোজনে বিরত থাকেন, এই দুই জনের পুণ্যফল সমান। সর্ব্বপ্রকার হিংসার সংস্রব শূন্য হইয়া যিনি ফলমূল নীবার ধান্যাদি ভোজন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা জীবন ধারণ করেন, তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ও মাংস বর্জ্জনকারীর ন্যায় পুণ্যোপার্জ্জনে সমর্থ হন না (৩) স্থানান্তরে উক্ত হই-

(১) বসা শুক্র মসৃঙ্মজ্জামূত্রবিট্ ঘ্রাণ কর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।
মনু ৫। ১৩৫।

(২) সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধ বন্ধৌচ দেহীনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥
মনু ৫। ৪৯।

(৩) বর্ষে বর্ষেহশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানিচ ন খাদ্যেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং॥
ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈ র্মুন্যন্নঞ্চ ভোজনৈঃ।
নতৎ ফল মবাপ্নোতি যন্মাংস পরিবর্জ্জনাৎ॥
মনু ৫ম। ৫৩। ৫৪।

য়াছে ঃ—যে ব্যক্তি জিহ্বার তৃপ্তিসাধনরূপ আত্মসুখেচ্ছায় অহিংসক পশুকে বধ করে, সে কি ইহকালে, কি পরকালে কখনও সুখলাভে সমর্থ হয় না (১)। মাংস ভক্ষণের দোষব্যঞ্জক ঈদৃশ বহুবিধ উক্তি নানা ধর্ম্মগ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি সমাজ কখনও যে একেবারে মাংস বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে। তাই পূজ্যপাদ ঋষিদিগের মাংসপরিবর্জ্জন বিষয়ক নিষেধ বাক্য সম্পূর্ণ রূপে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। যাহাহউক, তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, সমাজ হইতে মাংসভোজনের প্রথা উন্মূলিত হইল না, তখন তাহার সর্ব্বথা উন্মূলন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উহার সীমা নির্দ্ধারণে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা বিধান করিলেন যে, মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম এবং দেবকর্ম্ম এই সকল স্থানে পশুবধে দোষ নাই, অন্যত্র দোষ আছে (২)।

(১) যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্ম সুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব নকচিৎ সুখমেধতে ॥

মনু ৫ম। ৪৫।

(২) মধুপর্কেচ যজ্ঞেচ পিতৃদৈবত কর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যা ব্রবীন্মনুঃ ॥

মনু ৫।৪১।

এরূপ স্থলেও যে মাংস ইচ্ছা তাহাই ব্যবহার করিবার বিধান ছিল না; কোন্ কোন্ পশুর মাংস ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা নির্দ্ধারিত ছিল। মনু সংহিতার পঞ্চমাধ্যায় প্রায় এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ।

এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে যে পশু বধ করা হইত তাহার মাংস বৃথামাংস নামে অভিহিত হইত। এইরূপ বিশেষণ দ্বারাই উপলব্ধি হইতেছে যে, ঐরূপ মাংস ভক্ষণকে তাঁহারা নিতান্ত অবৈধ মনে করিতেন। সুধু ঐরূপ বিদ্বেষভাবসূচক নাম নির্দ্দেশ করিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, উহা ভক্ষণে নানাবিধ পারলৌকিক ভয় প্রদর্শনও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ঃ—যে দ্বিজ আপৎকাল ব্যতীত অবৈধমাংস ভোজন করেন, তিনি পরলোকে ভক্ষিতপশু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকেন (১)। স্থলান্তরে ইহাপেক্ষাও অধিক ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, বলিয়াছেন ঃ—যে ব্যক্তি বৃথা-মাংস ভক্ষণ করে সে সেই হত পশুর গাত্রের লোম-সংখ্যা যত, ততসংখ্যক বার প্রেতযোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে (২)। বৃথামাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে তাঁহারা এই-রূপ নানাবিধ নিষেধাত্মক পারলৌকিক বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, কি বৃথা মাংস, কি যজ্ঞাদিদত্ত মাংস, কোন রূপ মাংস ভক্ষণই আর্য্যগণ প্রশস্ত বলিয়া মনে করিতেন না। তবে যজ্ঞাদির উদ্দেশ্যে যে পশু

---

(১) নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্যতৈরদ্যতেঽবশঃ॥
মনু ৫। ৩৩।

(২) যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বাহি মারণং।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥
মনু ৫। ৩৮।

ত হয় তাহার মাংস ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয় বলিয়া তাহা ভক্ষণে তাদৃশ দোষ মনে করিতেন না এইমাত্র। যাহা হউক, তাঁহারা মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে কি জন্য সাধারণতঃ বিরোধী ছিলেন অতঃপর আমরা তাহারই হেতু নির্দ্দেশে প্রয়াস পাইব।

মাংস ভক্ষণের অনুকূলে যে সমস্ত হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষণ প্রধানতম। নানা কারণে বিশেষতঃ শরীরে অতিরিক্ত শৈত্য সংস্পর্শনিবন্ধন জীবনীশক্তির নিয়ামক তাপাংশের অনেক লাঘব হয়। যদি সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ উষ্ণধর্ম্মী খাদ্যাদি গ্রহণ দ্বারা পরিপূরিত না হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে শরীর নিস্তেজ হইতে থাকে এবং নানা প্রকার দুরারোগ্য পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। মাংস ভক্ষণে ঐ নষ্টতাপাংশের পরিপূরণ হয়, তাই মাংস ভক্ষণ আবশ্যক। এই যুক্তি শীতপ্রধান মেরুসন্নিহিত দেশের অধিবাসিদিগের সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে প্রযুজ্য হইতে পারে। কিন্তু, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবাসীর পক্ষে এই যুক্তি অনুসারে মাংস ভক্ষণ কদাপি সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা এদেশে স্বভাবতঃই উত্তাপের মাত্রা অধিক, তাহার মধ্যে মাংসাদি উষ্ণধর্ম্মী খাদ্য আহার করিলে শরীরে উত্তাপের মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ পীড়ার কারণ হইতে পারে। শাস্ত্রে যে মাংসাহারের বিরুদ্ধে এত কথা উল্লিখিত হই-

য়াছে তাহার প্রধান কারণই এই। অপর, বিশেষ দেশবাসিদিগের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি আমরা সমালোচ্য বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করি,—যদি মানবজাতি সাধারণের দৈহিক গঠন প্রণালীর প্রতি অভিনিবেশপূর্ব্বক মাংসাহারের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিষয় সমালোচনা করি, তাহা হইলেও আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকি। এইরূপ করিতে হইলে আমাদিগকে আমিষ ভোজী এবং নিরামিষ ভোজী জীবদিগের কতকগুলি অনন্যসাধারণ গঠন প্রণালী এবং সঙ্গে সঙ্গে অনন্যসাধারণ প্রকৃতির সমালোচনা করিতে হইবে। তুলনার সুবিধার জন্য আমরা ঐ সমস্ত বিষয় স্তম্ভাকারে বিনিবেশিত করিব।

আমিষ ভোজী।

সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি।

১। ইহাদের শিকার মারণোপযোগী শাণিত দশন, তীব্র ও সুদৃঢ় নখর প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রহরণ আছে।

২। ইহারা ঘর্ম্মত্যাগ করে না; মাংসাদি চর্ব্বণের পরিবর্ত্তে গিলিয়া ফেলে; জলাদি পানীয় দ্রব্য পানের পরিবর্ত্তে জিহ্বা দ্বারা লেহন করে; ইহাদের জিহ্বাতে লালা নাই। পরিশ্রম করিলে ইহাদের রোমকূপ দিয়া স্বেদবারি নির্গত হয় না, পরন্তু, জিহ্বা দ্বারা জলবৎ পদার্থ বিশেষ বহির্গত হইয়া থাকে।

নিরামিষ ভোজী।

গো, মেষ মহিষ, বানর প্রভৃতি।

(১) ইহাদের দশন এরূপ তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় নহে যে তদ্দ্বারা পশ্বাদি হনন ও তাহাদের মাংস কর্ত্তন করিতে পারে। অনেকেরই নখরের পরিবর্ত্তে খুর বা নখ আছে তাহাও এরূপ কার্য্যের উপযোগী নহে।

(২) ইহারা ঘর্ম্মত্যাগ করে; চর্ব্বণ করিয়া আহার করে, পানীয় দ্রব্য লেহনের পরিবর্ত্তে পান করে; জিহ্বাতে লালা আছে; পরিশ্রম করিলে ইহাদের জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায় এবং রোমকূপ দিয়া স্বেদবারি বহির্গত হইয়া থাকে।

উভয় শ্রেণীস্থ জীবদিগের গঠন প্রণালী এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কতিপয় পার্থক্য প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুষ্যের সহিত নিরামিষ ভোজী জীবদিগেরই বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে; এমত স্থলে, তাহাকে সেই শ্রেণীস্থ জীব বলিয়া মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

মনুষ্যের পাকস্থলীর আয়তন এবং পরিপাক কালীন তাহার যে অবস্থা হয় তৎপ্রতি প্রণিধান করিলেও তাহাকে নিরামিষভোজী বলিয়া মনে হয়। মাংসভোজিদিগের শরীরের সহিত তুলনায় তাহাদিগের পাকস্থলীর আয়তন অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র; উদ্ভিজ্জভোজিদিগের পাকস্থলী শরীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অল্প পরিমিত মাংসেই মাংসাশিদিগের শরীর পোষণোপযোগী সমস্ত পদার্থ থাকাতে তাহা ধারণ এবং পরিপাক করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট পাকস্থলীরই প্রয়োজন, তাই তাহাদের পাকযন্ত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু, উদ্ভিজ্জভোজিদিগকে বহু পরিমিত উদ্ভিজ্জ হইতে শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাই তাহাদের পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন বিশিষ্ট। মনুষ্যশরীরের আয়তনের সঙ্গে তুলনায় তাহার পাকস্থলী কিছু বৃহৎ। অতএব এতদ্দ্বারাও তাহাকে নিরামিষাশী মনে করা অযৌক্তিক নহে। অপর, মাংসাহার করিলে তাহা পরিপাচন কালে মনুষ্যের পাকস্থলী যেরূপ

অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করে, তাহাতে তাহাকে কোনও ক্রমে মাংসাশী মনে করা যাইতে পারে না (১)।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি নিচয়ের বিষয় প্রণিধান করিলেও আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি—মাংসাহার কদাপি তাহার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ নহে। দয়া, ভক্তি, প্রীতি, অহিংসা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ক্ষমা, শৌচ, নিরীহতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি সমুদয়ই মানব মনের ভূষণস্বরূপ; উহাদের পরিস্ফূরণ এবং পরিবর্দ্ধনেই তাহার মনুষ্যত্ব। কিন্তু, মাংসভোজনে উহাদের স্ফূর্ত্তি এবং পুষ্টি দূরে থাকুক, নিৰ্জ্জীবতা এবং অবসন্নতাই উপস্থিত হয়। মাংসভোজিরা প্রায়ই নিষ্ঠুর, ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ, দুর্দ্ধর্ষ

(১) "সেণ্টমার্টিন নামক একজন সৈনিক পুরুষের পাকস্থলী উত্তপ্ত ধাবমান গোলায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। চিকিৎসার দ্বারা সেই ঘোর দুর্দ্দৈব হইতে তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন; কিন্তু, আহত স্থানের ছিদ্র আরোগ্য হইল না। ডাক্তার বোমেণ্ট সেই ছিদ্রপথে পাকস্থলী মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দিতেন; তদ্দ্বারা কোন্ পদার্থ কত সময়ের মধ্যে জীর্ণ হইত এবং পাক প্রক্রিয়া কালে উক্ত যন্ত্রের কিরূপ অবস্থা ঘটিত, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন। সুরাপান করিলে রক্ত সঞ্চয় হইয়া পাকযন্ত্র যেরূপ বিকৃত দেখায়, মাংসভোজনেও ঠিক্ তদনুরূপ ঘটিয়া থাকে। পাকস্থলীর এরূপ অবস্থা বারম্বার উপস্থিত হইলে ক্রমে পরিপাক শক্তির ব্যতিক্রম জন্মে।"

কল্পদ্রুম, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা,

"আমিষ ভোজনের ঔচিত্যানৌচিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ।

এস্থলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমরা আরও বহু স্থলে ঐ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

এবং উগ্রস্বভাব হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে ইহার অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তত্তৎস্থলে মাংসাহারের পরিবর্ত্তে নিরামিষাহার গৃহীত হইলে যে ভোক্তার প্রকৃতি আরও উচ্চ না হইত তাহার প্রমাণ কি? এদিকে, নিরামিষভোজিদিগের মধ্যেও অনেক উগ্র স্বভাব প্রভৃতি দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন সত্য, কিন্তু, তত্তৎ স্থলে মাংসাহারে যে আরও দূষিত ফল না ফলিত তাহারই বা প্রমাণ কি? যাহা হউক, সাধারণতঃ মাংসভোজিগণ যে উক্তরূপ দোষ-বিশিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এমত স্থলে মনুষ্য কিরূপে স্বভাবসিদ্ধরূপে মাংসভোজী হইতে পারেন?

অনেকে মাংসভোজনের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থ মাংসভোজী ইংরেজ প্রভৃতি বীর্য্যবান জাতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন:—যদি এদেশীয়েরা ইংরেজ প্রভৃতির ন্যায় মাংসভোজন করিত, তাহা হইলে ইহারা বলশালী এবং কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত এবং তাহা হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশার অনেক লাঘব হইত। কিন্তু, তাঁহারা যদি ভারতের উষ্ণপ্রধান প্রকৃতির বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বোধ হয় ঐরূপ বলিতে পারেন না। ইংরেজ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য জাতীয়েরা শীতপ্রধান দেশের লোক। তাঁহাদের পক্ষে মাংসাদি উষ্ণধর্ম্মাত্মক খাদ্য কতক পরিমাণে আবশ্যক হইতে

পারে, কিন্তু এদেশবাসিদিগের পক্ষে তাহা কখনই মঙ্গলজনক নহে। এদেশের পক্ষে স্নিগ্ধ অথচ পুষ্টিকর খাদ্যই বিশেষ আবশ্যক। শস্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে শরীর রক্ষোপযোগী পুষ্টিকর পদার্থ আছে, অথচ সাধারণতঃ তৎসমস্ত স্নিগ্ধগুণযুক্ত, সুতরাং এদেশবাসিদিগের পক্ষে তৎসমস্ত ভোজনই বিশেষ উপযোগী (১)।

নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজনে মস্তিষ্ক সতেজ থাকে না বলিয়া যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহাদের আপত্তির খণ্ডন পক্ষে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষ এবং মহাত্মজনই নিরামিষভোজী ছিলেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ, প্রাচীন আর্য্য ঋষিমণ্ডলীর অধিকাংশ, পিথোগোরাস, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

নিরামিষভোজীরা প্রায়ই নিরোগী। এতদ্দেশীয় বিধবাগণ যে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকেন, নিরামিষ ভোজন তাহার একটী প্রধান কারণ সন্দেহ নাই।

নিরামিষ ভোজনে শরীর দুর্ব্বল হয় এবং শ্রমশক্তি ও অধ্যবসায়ের লাঘব হয় বলিয়া যাঁহারা মাংসাহারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আই-

(১) শস্যাদির মধ্যে উষ্ণধর্ম্মী পদার্থ নাই এবং উষ্ণধর্ম্মী খাদ্য এদেশের পক্ষে সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য এরূপ বলা হইতেছে না, কেবল মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু প্রভৃতি উত্তেজক এবং অত্যুষ্ণধর্ম্মী খাদ্য এদেশের পক্ষে উপযোগী নহে এই মাত্র বলাই আমাদের অভিপ্রেত।

রিসদিগের বলবিক্রমের কথা চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহা-দের প্রধান আহার্য্য আলু; অথচ ইহারা ইউরোপের মাংস-ভোজী কোনও জাতি অপেক্ষা বলবীর্য্যে বা পরিশ্রম-শক্তিতে হীন নহে বরং শ্রেষ্ঠ। আর দূরদেশের বিষয় ভাবিয়াই বা প্রয়োজন কি? এদেশের পশ্চিমাঞ্চলবাসি-দিগের কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইহারা প্রচুর বল-শালী, দৃঢ়কায় এবং কর্ম্মঠ। কিন্তু ইহাদের আহার্য্য মাত্র ডাল আর রুটী। এমত স্থলে নিরামিষ ভোজনের বিরুদ্ধে ঐ রূপ অভিযোগ কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

যাহা হউক, আমরা যতদূর উল্লেখ করিলাম তদ্দ্বারাই বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে যে, নিরামিষ ভোজনই মানব সাধারণের পক্ষে বিশেষতঃ ভারতবাসিদিগের পক্ষে প্রকৃতিবাঞ্ছিত সুতরাং মঙ্গলকর এবং আমিষ ভক্ষণ মানব সাধারণের পক্ষে বিশেষতঃ ভারতবাসিদিগের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ সুতরাং অমঙ্গলকর (১)। অতএব, পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণ কেন মাংসভোজনের এত বিরোধী ছিলেন তাহা বুঝিতে আর আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে

(১) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় স্বকীয় সুবিখ্যাত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থে বহুল যুক্তি এবং প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা এসম্বন্ধীয় সুবিস্তৃত বিচার দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক ঐ মূল্যবান গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

না। অতঃপর আমরা পলাণ্ডু ও রসুন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

এ স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। আহার্য্য এত বস্তু থাকিতে আমরা স্থধু মাংস ও পলাণ্ডু রসুন সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছি তাহার হেতু এই যে, আজকাল শিক্ষিত সমাজে উহাদের বড়ই ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। মাংস এবং পলাণ্ডু রসুন ব্যতীত আজ কাল আর প্রায়ই নব্য সম্প্রদায়ের আহার হয় না। যদি দৈবাৎ কেহ উহা ভক্ষণ না করেন তাহা হইলে তিনি ঘোর কুসংস্কারাবিষ্ট এবং মুর্খ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। যখন ইহারা সমাজে এতই প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ যখন হিন্দুশাস্ত্রে ইহাদের ভক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে, তখন ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অযৌক্তিক নহে। তাই আমরা অন্যান্য আহার্য্যের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

শাস্ত্রে পলাণ্ডু ও রসুনের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় স্থল বিশেষে উহাদিগকে দ্বিজাতিগণের অভক্ষ্য (১) এবং স্থলান্তরে জাতিচ্যুতির কারণ পর্য্যন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২)।

---

(১) লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকাণি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবাণি চ।
মনু ৫। ৫।

(২) পঞ্চমাধ্যায়ের ৮ম হইতে ২১ শ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—যদি কোন দ্বিজ ভ্রমবশতঃও পলাণ্ডু রসুন ভক্ষণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ত্রিরাত্রি উপবাসরূপ কঠোর ব্রতচর্য্যা এবং পঞ্চগব্য দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে (১)। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে পলাণ্ডু ও রসুন ভোজনে চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুচি হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে (২)। শব্দ কল্পদ্রুমে পলাণ্ডুশব্দপর্য্যায়ে যে পঞ্চদশটী শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটী এই :—তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, দীপন এবং মুগগন্ধক। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে পলাণ্ডু যবনপ্রিয়, দুর্গন্ধ এবং মুখদূষক শব্দে অভিহিত এবং গুণ সম্বন্ধে রসোন (রসুন) তুল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। ঈদৃশ নাম নির্দ্দেশ দ্বারাই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আর্য্য সমাজে উহা নিতান্ত জঘন্য দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত

(১) পীযূষশ্বেত লশুন বৃন্তাককবক গৃঞ্জনম্।
পলাণ্ডুং বৃক্ষনির্য্যাসং দেবস্বং কবকানি চ ॥

ত্রিরাত্রমুপবাসীস্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥
পরাশর সংহিতা, ১১ শ। ১০।১১

(২) পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম্য কুক্কুটং।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥

(৩) পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখ দূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ো রসোন সদৃশো গুণৈঃ।
শব্দকল্পদ্রুম।

হইত। নানা গ্রন্থে এই রূপ নানাবিধ নিষেধাত্মক বিধান দ্বারা পলাণ্ডু লশুন ভক্ষণের দূষণীয়তা প্রকটিত হইয়াছে। এখন আমাদের বিবেচ্য এই যে, ঐ রূপ নিষেধাত্মক বিধান অযৌক্তিক না যুক্তিসঙ্গত।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আমরা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারি যে, ঐরূপ নিষেধ কুসংস্কারমূলক কিংবা অযৌক্তিক নহে, প্রত্যুতঃ উহার মূলে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং ইহার অধিবাসীদিগের দৈহিক প্রকৃতিও উষ্ণপ্রধান হইবার বিষয় এবং দেহের এই উষ্ণতা মনেও সংক্রামিত হইয়া তাহার উগ্রতা, দুর্দ্ধর্ষতা প্রভৃতি উষ্ণগুণোপেত ভাব সকলকে প্রবুদ্ধ এবং সঞ্জীবিত করিবার একান্ত সম্ভাবনা। কিন্তু মনের এই রূপ উষ্ণতা—কঠোর বৃত্তিনিচয়ের এইরূপ পরিস্ফুরণ - মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে, প্রত্যুতঃ উহা মনুষ্যত্বের নাশক। যাহা লইয়া মনুষ্য জীবজগতের শিরোদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, যাহা লইয়া তিনি পরম পদার্থের পবিত্র সন্নিধানে যাইবার অধিকারী—তাহা, সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসমূহ—উষ্ণধর্ম্মী নহে, প্রত্যুতঃ শীতগুণোপেত—স্নিগ্ধ কোমল এবং মধুর। যদি এই স্নিগ্ধধর্ম্মী বৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, যদি ইহাদের নিষ্প্রভতায় এবং অন্তর্ধানেই তাঁহার পশুত্ব, তাহা হইলে যে খাদ্য গ্রহণে ইহার ব্যত্যয় হয়—যাহা গ্রহণে

ইহাদের বিনিময়ে উষ্ণধর্ম্মা দুর্দ্ধর্ষতা, ঈর্ষ্যা, অসুয়া, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি নিচয়ের বলবত্তা এবং কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে খাদ্য—সেই পলাণ্ডু প্রভৃতি উষ্ণধর্ম্মা খাদ্য কিরূপে মানবমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষতঃ গ্রীষ্মমণ্ডবাসী ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে? আমরা শুধু যৌক্তিক সিদ্ধান্তের (Theory) প্রতি নির্ভর করিয়া এইরূপ বলিতেছি না, দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তাঁহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ প্রবৃত্তির কার্য্য কত অধিক। এতদ্দেশীয় বিচারালয়ে নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি ভয়ানক অপরাধঘটিত যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশেই মুসলমান অপরাধী দেখিতে পাইবে। দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সুকুমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচায়ক কার্য্য ইহাঁদের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাইবে। ইহার প্রধান কারণ সর্ব্বদা উষ্ণধর্ম্মা পলাণ্ডু, রশুন, গোমাংস প্রভৃতি খাদ্য ভক্ষণ। অপর, ঈদৃশ উষ্ণবীর্য্য খাদ্য গ্রহণ নিবন্ধন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নাকড়া (Polypus) প্রভৃতি দুই একটী পীড়া এমন দৃষ্ট হইয়া থাকে যাহা প্রায় ইহাদের সম্বন্ধেই একচেটিয়া। অন্ধ, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ প্রভৃতির সংখ্যাও এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিক। অপর, ইহাঁরা উক্তরূপ উত্তেজক দ্রব্য সর্ব্বদা আহার

করেন বলিয়া ইহাঁদের কুপ্রবৃত্তির কার্য্য অতিশয় অধিক এই জন্য অতি সত্বরেই অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিচালন নিবন্ধন ইহাঁরা ইন্দ্রিয়-শিথিলতা প্রভৃতি দুরারোগ্য এবং লজ্জাজনক পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আমরা কল্পনা-বলে এরূপ বলিতেছি না, কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগ এবং রোগী সম্বন্ধীয় রিটর্ণ পাঠ কর—দেখিবে ঐরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কত অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল পবিত্র হিন্দু-সমাজেও ঐরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে—অনেকেই ঐরূপ পীড়ায় পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতেছেন। কিন্তু, এই "অনেক" কাহারা? অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে—খাদ্যাখাদ্যে বিচারবিহীন সর্ব্বভুক্প্রায় মুসলমানত্বপ্রাপ্ত নব্য বাবুদের অধিকাংশই ঐ "অনেক" শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট।

যাহা হউক, আমরা আর বিশেষ-দোষ-দুষ্ট খাদ্য-বিশেষের সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আর্য্যগণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দোষযুক্ত খাদ্যগ্রহণ দোষাবহ মনে করিতেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

শাস্ত্রমতে অন্নাদির ত্রিবিধ দোষ:—দৃষ্ট, অদৃষ্ট এবং দৃষ্টাদৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে দৃষ্টদোষ; স্মৃত্যুক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে অদৃষ্টদোষ এবং উভয় দোষাত্মক দ্রব্য ভোজনে অর্থাৎ যাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত

আন্ত্ররোগজনক রূপ দৃষ্টদোষযুক্ত না হইলেও বহু পরিমাণে তজ্জন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যনিচয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও বহু পরিমাণে তজ্জন্য, এইরূপ দ্রব্য ভোজনে দৃষ্টাদৃষ্ট দোষ জন্মে। পর্যুষিত এবং পূতিগন্ধযুক্ত অন্নাদি দৃষ্টদোষের; পলাণ্ডু রসুনাদি অদৃষ্টদোষের (১) এবং বালবৎসা ও মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধাদি দৃষ্টাদৃষ্ট

(১) পলাণ্ডু লসুনাদিকে অদৃষ্ট-দোষ-খাদ্য-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট দেখিয়া পলাণ্ডু লসুন ভোজীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন না; কেন না, উহার অর্থ এরূপ নয় যে, উহা ভক্ষণে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। উহার অর্থ এই যে, ঐরূপ দ্রব্য ভক্ষণে যেরূপ দোষ বা অপকারিতা জন্মে তাহা আশুপ্রত্যক্ষ নয়; উহা প্রত্যক্ষ হইতে কালবিলম্বের আবশ্যক। আমরা'ও তাহাই বলিয়াছি। অপর, দৃষ্ট দোষই হউক, আর অদৃষ্টদোষই হউক, উহা যে দোষজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে দৃষ্টদোষদুষ্ট দ্রব্য খাদ্যাদির অপকারিতা যেরূপ আশুপ্রত্যক্ষ এবং যে জাতীয়, উহাদের অপকারিতা সেইরূপ আশুপ্রত্যক্ষ বা তজ্জাতীয় নয় এইমাত্র।

(ক) অশুচি এবং পাপী ব্যক্তিদিগের হস্তান্নও স্মৃতিশাস্ত্রে পরিত্যজ্য বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাও অদৃষ্টদোষ খাদ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। নারীনীতি প্রণেতা পণ্ডিত ঈশান চন্দ্র বসু বলেন—"অশুচি ও পাপী লোকদিগের হস্তের অন্নকে পাপান্ন বলে। কদাচারী পাপী লোকদিগের সংসর্গে থাকিলে যদি অধর্মের প্রতি মমতার হ্রাস হয়, তবে তাহাদের হস্তের অন্ন গ্রহণ করিলে যে চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব এমন ব্যবস্থা করিবে যেন পরিজনবর্গকে পাপান্ন গ্রহণ করিতে না হয়।"

নারীনীতি, ৫১ পৃঃ।

দোষের দৃষ্টান্তস্থল (১) এই ত্রিবিধ দোষযুক্ত অন্নাদির গ্রহণে তাঁহারা একান্ত অবৈধ সুতরাং পাপজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আহারের সহিত শরীরের, শরীরের সহিত মনের এবং মনের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে ঐরূপ বিশ্বাস কদাপি কুসংস্কারমূলক হইতে পারে না। মনে কর তুমি পরাধীন ভৃত্য, প্রভুর আজ্ঞা পালন এবং পদলেহনই তোমার জীবনের ব্রত; কিরূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবে, কি করিলে তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন এই ভাবনাতে তুমি অস্থির। নিয়মিত সময়ে আহার নাই; সদ্যপক্ক অন্ন তোমার অদৃষ্টে নাই, নিয়ত পূতি এবং পর্য্যুষিত খাদ্য তোমার আহার; এরূপ স্থলে তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। ঐরূপ আহার্য্য গ্রহণে তোমার শরীর শীর্ণ, নিস্তেজ এবং জড়ভাবাপন্ন হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তি, প্রসন্নতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতিরও লাঘব হইতে থাকিবে। মনের এই অবসন্নাবস্থার সহিত তোমার হৃদয়নিহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণেরও ব্যাঘাত না হইয়া পারিবে না। সুতরাং তুমি ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম কার্য্যেও ঔদাস; এবং আলস্য প্রকাশ করিতে থাকিবে এবং এইরূপে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্বের উচ্চ আসন হইতে ক্রমশঃ পশুত্বের নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিবে। পক্ষান্তরে, মনে কর, তুমি ভোগবিলাসী বাবু, কিরূপে বিলাস

(১) নিবিধার সম্বন্ধে মনুসংহিতা ৪র্থ অঃ ২০৭—২১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বাসনা চরিতার্থ করিবে, কিরূপে কেহ্যন্ত্র প্রচুর বলের সহিত—অদম্য বেগের সহিত—সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইবে, এই অনুধ্যানই তোমার জীবনের ব্রত। তুমি এই ব্রতচর্য্যার জন্য নিয়ত নানাবিধ মাংস, ডিম্ব, পলাণ্ডু প্রভৃতি উষ্ণধর্ম্মী খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকিলে। এমত স্থলে তোমার অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। উত্তরোত্তর ঈদৃশ উত্তেজক আহার্য্য গ্রহণে তোমার কুপ্রবৃত্তিরূপ প্রবল বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতে থাকিবে, সেই বহ্নির দারুণ সন্তাপে তোমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহ একে একে ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ করিবে। আজ পুড়িবে ধৈর্য্য, কাল পুড়িবে ক্ষমা, পরশ্ব দিন পুড়িবে তিতিক্ষা, তৎপর দিন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তৎপর দিন অন্য কিছু। এইরূপ পুড়িতে পুড়িতে তোমার ধর্ম্মশালাস্বরূপ হৃদয়মন্দির পাপের অপবিত্র লীলাকানন হইয়া উঠিবে। তথায় কাম, ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তিনিচয় মনের সুখে নৃত্যগীত, আমোদ প্রমোদ করিতে থাকিবে, তুমি মনুষ্যত্বের পুণ্য ভূমি হইতে অধঃপতিত হইতে হইতে পশুত্বেরও নিম্ন ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ, যদি আহার বিশেষের গ্রহণ-পরিবর্জ্জনে এতদূর হওয়া সম্ভবপর, যদি ইহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য এতদূর দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ, তাহা হইলে খাদ্যাদির সম্বন্ধে কতদূর সাবধানতা আবশ্যক, কতদূর সূক্ষ্ম

বৃদ্ধির সহিত অস্মাদির দোষ গুণ নির্দ্ধারণ প্রয়োজনীয় যদি হইয়াই হইল, তাহা হইলে নিষিদ্ধান্ন ভোজনে পাপ হয় বলিয়া আর্য্যগণ যে বিশ্বাস করিতেন তাহা কিরূপে ভ্রান্ত-সংস্কার মূলক বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পার? কিরূপে তাঁহাদের ভূয়োদর্শনজনিত ব্যবস্থাকে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত প্রলাপ বলিয়া অবহেলা করিতে পার?

তিথি ভেদে আহার ভেদ।

আহার সম্বন্ধে যে যে বিভিন্ন প্রকার নিয়মের বিষয় উল্লিখিত হইল তাহার কোনটীই বক্ষ্যমাণ নিয়মের ন্যায় অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া আইসে নাই। এই নিয়মের উপযোগিতা এবং গুরুত্ব সমাজ-হৃদয়ে এতদূর জাগ্রতভাবে চলিয়া আসিয়াছে যে, উহা আর দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রপৃষ্ঠে নিবদ্ধ না রহিয়া সামান্য গৃহপঞ্জিকার পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে দৈনিক বিধান রূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। একখানি পঞ্জিকা উদ্‌ঘাটন কর—দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রত্যেক দিনে, প্রত্যেক তিথিতে—এক দ্রব্য না এক দ্রব্য ভোজনে একরূপ না একরূপ ঐহিক বা পারত্রিক অকল্যাণের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণে পুত্রহানি, একাদশীতে সিমভক্ষণে মহাপাপ, দ্বাদশীতে পূতিকা ভোজনে ব্রহ্মহত্যা পাতক, এইরূপ এক এক তিথিতে এক এক বিশেষ দ্রব্য ভোজনে এক একরূপ পাপ বা অনিষ্টের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে কি না আমরা এখন তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সকলেই অবগত আছেন চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থান ভেদে জোয়ারের তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন তিথিতে বা জোয়ারের বেগের বৃদ্ধি আবার কোন তিথিতে বা তাহার হ্রাস হইয়া থাকে। এই হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম যে সুধু সমুদ্রাদি ব্যাপক-জলখণ্ডেই কার্য্যকারী হয় তাহা নহে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জলীয় পদার্থের উপরই উহা আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন ক্ষুদ্রতর জলখণ্ডে অথবা অল্পতর জলীয় পরমাণু বিশিষ্ট পদার্থে উহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে না এই মাত্র। এই নিয়মানুসারে মানব-শরীরও জোয়ারের ক্রীড়াভূমির অন্তর্গত, তথায়ও ইহা আপনার কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিথি বিশেষে যে আমরা শরীরের ভাবান্তর উপলব্ধি করিয়া থাকি, অনেক সময়ে যে অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি কতিপয় তিথিতে জ্বর জ্বর বা অঙ্গবিশেষে বেদনা অনুভব করিয়া থাকি, আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ ঐ জোয়ারের প্রকোপবৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ। আবার অনেক তিথিতে যে আপনা হইতেই ঐ সকল চলিয়া যায়, শরীর স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে, তাহাও ঐ জোয়ারেরই প্রকোপ হ্রাস নিবন্ধন। বাস্তবিক, বিভিন্ন তিথিতে

যেমন রসের মাত্রার বা অবস্থার তারতম্য হইতে থাকে, তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভাবান্তর সংঘটিত হইতে থাকে। ইহা কাল্পনিক কথা নহে, প্রাত্যহিক পরীক্ষালব্ধ-সত্য। এদিকে, আহার্য্যরূপে যে যে বস্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহারাও ঐরূপ জোয়ারের অনধীন নহে. জোয়ারের ক্রিয়া তাহাদেরও উপর একেবারে হয় না এরূপ বলিবার উপায় নাই। সুতরাং তিথি ভেদে তাহাদেরও যে ভাবান্তর—গুণান্তর--না জন্মিতে পারে এমন বলা যায় না। অতএব তিথি বিশেষে ভোক্তা ও ভোজ্য উভয়েরই ভাবান্তর বা অবস্থান্তর সংঘটিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে, এই ভাবান্তর-গত ভোক্তার শরীরে এইরূপ ভাবান্তরগত ভোজ্যের ক্রিয়াগুণ সংক্রামিত হইয়া যে নূতন রূপ ভাবান্তরের উৎপাদন করিতে পারে তাহাও অস্বীকার্য্য নহে। সুতরাং তিথি বিশেষে আহার্য্য বিশেষ শরীরস্থ হইয়া যে তাহার অবস্থান্তর সংঘটিত করিতে পারে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। অতএব তিথি বিশেষে আহার্য্য বিশেষের গ্রহণ-পরিবর্জ্জন-বিষয়ক বিধান বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইতেছে না। (১) এখন আপত্তি হইতে পারে, তিথি বিশেষে শরীরস্থ হইয়া তাহার ভাবান্তর জন্মাইতে পারে ইহা যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু কোন তিথিতে কোন দ্রব্য

(১) সুধু ইহা কেন, তিথি বিশেষে একেবারে আহার বর্জ্জনও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নয়। যদি কোন ও দিন পাকস্থলীকে বিশ্রাম না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমাগত পরিশ্রম নিবন্ধন উহার স্বাভাবিক

শরীরস্থ হইলে কিরূপ ভাবান্তর বা পীড়া জন্মিয়া থাকে তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান সহজ কথা নহে; কেননা, কোন ও দৃশ্য পদার্থের বা পরিবর্ত্ত-

---

বলের হ্রাস হইতে থাকে, সুতরাং উত্তম রূপে পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অতএব কিছুদিন পরে পরে একাধ দিন পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত উপবাস করা অযৌক্তিক নহে। অপর, ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ শারীর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গেল যে দূষিত পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহা যদিও মলমূত্র, স্বেদ শ্লেষ্ম রূপে বহির্গত হইয়া থাকে, তথাপি নানা কারণে তাহার সমস্তাংশ বহির্গত হইতে না পারিয়া কিয়দংশ শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে। শরীরে এইরূপ দূষিত পদার্থের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য হানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এনিমিত্ত এমন কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যদ্দ্বারা সহজে ঐ সঞ্চিত অংশ বহিষ্কৃত বা পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। মধ্যে মধ্যে উপবাসদ্বারা এ উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে। এইরূপ উপবাস দ্বারা সঞ্চিত রসাংশের বিলক্ষণ হ্রাস হয়। তবে এইরূপ উপবাস দ্বারা যে অনেক সময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য না জন্মে তাহা নহে। কিন্তু, সে দৌর্ব্বল্য অধিক সময় থাকে না, এক দিনেই তাহা চলিয়া যায়, অথচ তদ্দ্বারা যে উপকার লাভ হয় তাহা অতি মূল্যবান। বাস্তবিক মধ্যে মধ্যে উপবাসের দ্বারা শরীরে দূষিত পদার্থের হ্রাস হয়, পাকস্থলীর বল বৃদ্ধি হয়, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় সহজে কাতর হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কিন্তু, উপবাসের এই সমস্ত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার ব্যবধানের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, তাহা হইলে কেহবা দুইচারি দিন অন্তে, কেহবা দুই চারি কি ছয়মাস অন্তে, অথবা কখন ও একই ব্যক্তিই একবার দুদিন পরে অন্যবার দুমাস পরে উপবাস করিয়া উপবাসের প্রকৃত উপকার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় শাস্ত্রকারগণ অনেক সময়ের জন্য উপবাসের ব্যবধানকাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত নির্ণীত-ব্যবধান বিশিষ্ট

নের উপর ঐরূপ উত্তর নির্ভর করে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,যখন কালবিশেষে ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর, তখন শাস্ত্রোক্ত কাল বিশেষই যে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের যথার্থ কাল নহে—শাস্ত্র নিষিদ্ধ দিনে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে যে ঐরূপ অনিষ্ট সংঘটন হয় না—তাহারই বা প্রমাণ কি ? তবে, বলিতে পার,এস্থলে প্রমাণের ভার শাস্ত্রসমর্থন-কারীর উপর, কেননা এস্থলে তিনিই বাদী ; সুতরাং তাঁহার প্রতিপক্ষ শাস্ত্রবিরুদ্ধবাদী কেন ঐরূপ প্রমাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ইহা অযৌক্তিক নহে বটে, কিন্তু, বিরুদ্ধবাদী যদি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারিতেন যে ঐরূপ শাস্ত্রোক্তি ভ্রমাত্মক; তাহা হইলে কি তাঁহার পক্ষ আরও প্রবল হইত না ? যাহা হউক, এস্থলে অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যেমন আমরাও কোন প্রত্যক্ষ

উপবাসের মধ্যে একাদশীর উপবাস প্রধানতম। অন্যান্য উপবাসাপেক্ষা একাদশ্যুপবাসের এই প্রাধান্যকীর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ স্থলে কেহ কেহ বলেন যে, দশমী হইতেই শরীরে রসসঞ্চয় হইতে আরম্ভ করে এবং পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত তাহা সঞ্চিত হইতে থাকে। এমতস্থলে সঞ্চারের ৪।৫ দিন পরে উপবাস করিলে রস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া অনিষ্ট জন্মাইতে পারে, এই জন্য সঞ্চারের একদিন পরে অর্থাৎ একাদশীর দিন উপবাস করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, যে তিথিতেই কেন না হউক, মাসের মধ্যে দুই একবার নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে উপবাস করিতে পারিলে যে কিছু উপকার হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রমাণ দ্বারা আমাদের কথার যাথার্থ্য স্থাপিত করিতে পারিলাম না, তেমনি তিনি ও কোন প্রমাণ দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং এপর্য্যন্ত উভয় পক্ষ সমানই রহিয়া গেল। এখন আমাদের অনুকূলে যদি একটীমাত্র হেতুও প্রদর্শন করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের পক্ষ বলবান হইল মনে করিতে পারি। আমরা আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞান পূর্ণতাকেই (১) সেই হেতু মনে করিয়া থাকি। যখন আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত ব্যবস্থা নিচয়ের অনুসারী হইয়া চলিলে প্রায় সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করা যায় এবং যখন তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া চলিলে পদে পদে নানারূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় এবং যখন স্মৃত্যাদিবিবৃত উক্তরূপ নিদ্ধারণ সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনুমোদিত, তখন আহার্য্যবিশেষ যে নিষিদ্ধ সময়ে শরীরস্থ হইলে আশঙ্কানুরূপ পীড়াদির উৎপাদক না হইতে পারে তাহা কেমনে স্বীকার করিব?

(১) পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, গতবৎসর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কতিপয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার গবর্ণমেণ্টের জিজ্ঞাসাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সম্বন্ধে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে উহাকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বস্ব অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। অনেকেই অনুমান করেন তাঁহারা স্বস্ব অবলম্বিত চিকিৎসা পদ্ধতির মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্ব্বেদের উপর ঐরূপ অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে জন্যই কেন তাঁহারা ঐরূপ না করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ কথা যে অসার বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বরং আশঙ্কানুরূপ ফল নিতান্তই সংঘটিত হইয়া থাকে বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয়। তবে সেইরূপ ফল সংঘটন নিতান্ত সূক্ষ্মাকারে, এমন কি বহু সময়ে অনুভব-সীমারও বাহিরে সম্পন্ন হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, এতদ্দ্বারাই তিথিভেদে আহার ভেদের উপযোগিতা নিঃশেষ হইল না, উহার আরও যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে, এখন আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

মানব শরীর বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক-ভূষণ কেশজালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত শরীর মধ্যে যত কিছু দেখিতে পাও উহার কোনটীই মৌলিক পদার্থ নহে, সকলটীই নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ জনিত পরিণাম-বিশেষ। একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর "মানব শরীর কি?" তিনি তোমায় বলিবেন "উহা আর কিছুই নহে, কেবল কতকগুলি অঙ্গার, চূর্ণ, ফস্ফরস্, সোডিয়াম, লৌহ, পটাশিয়াম, ম্যাগ্নেশিয়াম্ এবং সিলিকন নামক পদার্থ বিশেষের সমবায়ভূত জড়পিণ্ড মাত্র, যাহার বিধান-সন্নিবেশের অভ্যন্তর প্রদেশ ভূরি পরিমিত অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এবং কিয়ৎপরিমিত নাইট্রোজেন নামক বাষ্প বিশেষের দ্বারা পরিপূরিত রহিয়াছে।" মানব শরীর যখন এইরূপ বিভিন্ন উপাদানে সংগঠিত, তখন ইহার সংরক্ষণ এবং পুষ্টি সাধনের জন্যও সর্ব্বদা ঐরূপ

বিভিন্ন ধর্ম্মী পদার্থের স্রোত শরীরে প্রবাহিত রাখিবার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যকীয়। কেন না, তাহা না করিলে হয়ত একজাতীয় পদার্থ দীর্ঘকাল গৃহীত হইতে হইতে শরীরে তদ্ধর্ম্মীপদার্থের মাত্রাধিক্য জন্মিয়া পীড়াজনক হইতে পারে এবং অপরদিকে অন্যান্য গুণবিশিষ্ট পদার্থের মাত্রার ন্যূনতা জন্মিয়া কোনরূপ পীড়ার উদ্ভব করিতে পারে। বাস্তবিক, বিভিন্ন বিধানের পোষণ জন্য বিভিন্ন উপকরণই আবশ্যক। যে আহার্য্য অস্থির পোষক তাহা হয়ত মস্তিষ্কের পক্ষে হিতজনক নহে, আবার যাহা মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারজনক হয়ত তাহা মেদের পক্ষে উপকারক নহে। এইরূপ যাহা একরূপ বিধানের পুষ্টিসাধন করে তাহা হয়ত অপর কোন বিধানের উপর আপনার উপকারিণী শক্তি প্রকাশিত করে না; অথচ অস্থি, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনী, কেশ নখ প্রভৃতি সমস্তেরই পরিপোষণ আবশ্যক, সুতরাং বিভিন্ন গুণযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ নিতান্তই আবশ্যকীয়। তিথিভেদে আহার ভেদের বিধান দ্বারা এই মহদুদ্দেশ্য অনেকাংশে সাধিত হইয়া থাকে।

অপর, প্রতিদিন একরূপ দ্রব্য আহার করিতে আহারে রুচি থাকে না সুতরাং তৃপ্তমনে কিম্বা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা যায় না। তৃপ্তির সহিত আহার করা না হইলে যে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য শরীরস্থ হইতে না পারিলে যে শারীর যন্ত্রসকল ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং

তন্নিবন্ধন নানারূপ পীড়ার কারণ হয় তাহা কাহারও পক্ষে দুর্ব্বোধ্য নহে। অতএব উক্তরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য বিভিন্ন জাতীয় আহার্য্য গ্রহণের বিধান ব্যবস্থিত হওয়া আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ বিধানদ্বারা ঐ উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া থাকে।

তিথিভেদে আহার ভেদের বিধান দ্বারা আরও একটী অনিষ্টের আশঙ্কা বহু পরিমাণে নিবারিত হইয়া থাকে। সে অনিষ্ট—একত্র বহুদ্রব্য ভোজন। দীর্ঘকাল এক দ্রব্য ভোজনে যেমন অপকারের সম্ভাবনা, একবারে বহুদ্রব্য ভোজনেও সেইরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। উক্ত বিধানানুসারে যখন প্রতিদিনই একটী না একটী দ্রব্য ভোজনে বিরত থাকিতে হয়, তখন দীর্ঘকাল ক্রমাগত বহুদ্রব্য ভোজনের সুবিধা এবং সম্ভাবনারও অনেক হ্রাস হয়, সুতরাং তজ্জনিত অপকারের সম্ভাবনাও বহুপরিমাণে তিরোহিত হয়।

এইরূপে দৃষ্ট হইতেছে যে, তিথিভেদে আহারভেদের বিধান দ্বারা আমাদিগের নানাপ্রকার হিত সাধিত হইতে পারে। অপর, সুধু তিথিভেদে আহার ভেদের ব্যবস্থা করিয়াও শাস্ত্রকারগণ তৃপ্তিলাভ করেন নাই, তাঁহারা ঋতু, নক্ষত্র এবং বারভেদেও আহার ভেদের বিধান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিধানের মূলেও যে প্রাগুক্তরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা আহার সম্বন্ধে আর অধিক দূরে যাইব না। অতঃপর তৎপরানুষ্ঠেয় দুই একটী বিধানের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই যামার্দ্ধ-কৃত্যের উপসংহার করিব।

আচমন।

আহারের পর মুখ প্রক্ষালনের বিধান। এই বিধান সুধু হিন্দু সমাজে নয়, সমস্ত সমাজেই—এমন কি নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে। সুতরাং উহা যে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী তাহা বিনা প্রমাণ প্রয়োগেও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। তবে, অন্যান্য সমাজের মুখ প্রক্ষালনের বিধান হইতে আর্য্যসমাজের মুখপ্রক্ষালন সম্বন্ধীয় বিধান কিছু ভিন্ন প্রকারের, তাই তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অন্যায় হইবে না।

হিন্দুশাস্ত্রে আহারান্তর-কর্ত্তব্য মুখ প্রক্ষালন ক্রিয়াটী আচমন শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং ঐ আচমন শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া আঁচান শব্দে পরিণতি পাইয়াছে। কিন্তু, এইরূপ অপভ্রংশে আচমন শব্দের সমগ্র অর্থ প্রকাশিত হয় নাই, উহার মাত্র একার্থই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক, আচমন শব্দ সুধু আহারান্তর-কর্ত্তব্য মুখ প্রক্ষালন অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, অন্যান্য বহু-সময়-কর্ত্তব্য মুখ প্রক্ষালনও ইহার অঙ্গীভূত। নিষ্ঠীবন, তৈলমর্দ্দন, পদপ্রক্ষালন, উচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শ প্রভৃতি বহু কার্য্যের পরে যে মুখপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমস্তই

আচমন শব্দের বিষয়ীভূত(১)।পক্ষান্তরে পূজাদি দৈবকর্ম্মের এবং শ্রাদ্ধাদি পৈত্রকর্ম্মের এবং আরও শুদ্ধিবিধায়ক বহু কর্ম্মের পূর্ব্বে যে জলগণ্ডূষ হস্তে লইয়া প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, তাহাও আচমন নামেই অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু, উহার অপভ্রংসীভূত আঁচান শব্দ এত বহ্বর্থবোধক নহে, উহা মাত্র আহারান্তর-কর্ত্তব্য মুখপ্রক্ষালনার্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহাহউক, যদিও আর্য্যগণ আহারান্তে কি কি অনুষ্ঠান করিতেন এখন তাহাই আমাদের সমালোচ্য, তথাপি তাঁহারা নানা কার্য্যে আচমনের বিধান কেন করিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহারও মূলে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। আচমনে শীতল জল ব্যবহার করিতে হয়। শীতল জল ঈষৎ সঙ্কোচক। যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল জলস্পর্শ হয় তাহা ঈষৎ সঙ্কোচভাবাপন্ন হয়। সঙ্কোচন হইলেই উহার বিধান সন্নিবেশ কিছু দৃঢ় হয়, সুতরাং উহার দৃঢ়তা এবং সজীবতা জন্মে। এই দৃঢ়তা এবং

(১) নিষ্ঠীবনে তথাভ্যঙ্গে তথা পাদাবসেচনে।
উচ্ছিষ্টস্য চ সম্ভাষাদশুচ্যুপহতস্য চ॥
সন্দেহেষু চ সর্ব্বেষু শিখাং বদ্ধা তথৈবচ।
বিনাযজ্ঞোপবীতেন নিত্যমেব মুপস্পৃশেৎ॥
উষ্ট্রবায়স সংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসীনাং।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্মৃতিবচন।

সজীবতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু, যখন নানা কারণে পুনঃপুনঃই আচমনের ব্যবস্থা আছে তখন এক এক-বারের আচমনের ফল এক একটু স্থায়ী হইতে হইতে সমষ্টিতঃ উহার কার্য্যকারিতা প্রায় স্থায়ীই হইয়া পড়ে। মুখাভ্যন্তরে জলগণ্ডূষ প্রদত্ত হইলে দন্তমূল সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং দন্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ থাকে, পুনঃ পুনঃ বাক্যোচ্চারণ প্রভৃতি নিবন্ধন জিহ্বার যে শৈথিল্য জন্মে তাহা বিদূরিত হইয়া তাহার সজীবতা জন্মে এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত মুখমণ্ডলই যেন কিছু সজীবতা লাভ করে। অপর, পুনঃ পুনঃ মুখ ধৌত হইলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, জিহ্বা পরিষ্কৃত হয়, শরীর যেন স্ফূর্ত্তি লাভ করে। ইহা কল্পনার কথা নহে। শীতল জল দ্বারা যদি মুখাভ্যন্তর এবং সমগ্র মুখমণ্ডল উত্তম রূপে ধৌত করা যায় তাহা হইলে শরীর বাস্তবিকই নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শরীরের এই স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনেরও স্ফূর্ত্তি জন্মে, আর যেন কেমন এক প্রশান্ত ভাব অনুভূত হয়। অপর, মুখ প্রক্ষালন কালে স্বভাবতঃই চক্ষুর্দ্বয়ে জল প্রক্ষেপ দিতে ইচ্ছা হয়, আর প্রক্ষেপ না দিলেও প্রায়ই সিক্ত হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়। আর শুধু ইচ্ছার কথাই বা বলি কেন, ভোজনান্তর-কর্ত্তব্য আচমন শেষ হইলে এইরূপ আর্দ্র হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিবার স্পষ্ট বিধানই রহিয়াছে। উক্ত আছে, এইরূপে চক্ষুতে যে জলকণা প্রবিষ্ট হয় তাহা অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করে

(১)। চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ শীতল জল সংস্পর্শ হওয়াতে উহারও নানা রূপ উপকার হয়। দীর্ঘকাল দর্শন কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দর্শনস্নায়ু (Optic nerve) যে কিছু শিথিল ভাবাপন্ন এবং দুর্ব্বল হয়, শীতল জল স্পর্শে তাহা দূর হইয়া উহার সজীবতা জন্মে, দৃষ্টি শক্তি প্রসন্ন হয় এবং সাধারণ ভাবে উহার কার্য্য ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মুখ প্রক্ষালনের এইরূপ নানাবিধ শারীরিক উপকারিতা আছে। উহাতে চিত্তশুদ্ধিরও বিশেষ সাহায্য হয়। অনেকেই জানেন ঈশ্বরোপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হস্তপদ এবং মুখাদি প্রক্ষালন করিলে মনের প্রসন্নতা, সজীবতা এবং একাগ্রতা জন্মে। অপর, পরিশ্রমের পর শরীর যখন অবসন্ন বোধ হয়, মন যখন স্ফূর্ত্তি হীন এবং ক্লিষ্ট হয়, কোন বিষয়ে অভিনিবেশ করিতে যখন একান্তই বিরক্তি বোধ হয়, তখন যদি উত্তমরূপে মুখের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগ শীতল জল দ্বারা ধৌত করা যায় তাহা হইলে যে ঐ অবসন্নতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা এবং বিরক্তি-ভাবের অনেক লাঘব হয় এবং মন যে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজেই চিন্তিতব্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে ইহাও অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব যখন আচমন দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও

(১) ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা অযৌক্তিক হইতেছে না।

আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম উহা সাধারণ আচমন সম্বন্ধে, অতঃপর আমরা ভোজনান্তর-কর্ত্তব্য বিশেষ আচমন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এ সময়ের আচমন অন্য সময়ের আচমনের ন্যায় সংক্ষেপে হইতে পারে না, অন্য সময়ে যেমন ওষ্ঠ প্রান্তে একটুকু জল প্রদান করিলেও আচমন-বিশেষ হইতে পারে, এ আচমনে তাহা হইবার উপায় নাই। এ সময় প্রচুর পরিমাণে জল দ্বারা বহুসংখ্যক কুল্লী (কুলকুচা) করিতে হয়। উক্ত আছে ঃ—তিনবার করিয়া জল মুখে লইয়া একবার পরিত্যাগ এইরূপ পাঁচবার ও পাঁচ বার করিয়া জল মুখে লইয়া একবার পরিত্যাগ এইরূপ তিন বার এবং তদনন্তর দ্বাদশ কুল্লী করিলে মুখশুদ্ধি হয় (১)। এইরূপ অধিক সংখ্যক কুল্লীর ব্যবস্থা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয় যে, যাহাতে মুখে কিছু মাত্র উচ্ছিষ্ট না থাকে—যাহাতে আহার্য্যদ্রব্যের বিন্দুমাত্রও মুখাভ্যন্তরে সংলগ্ন থাকিয়া অপবিত্রতা না জন্মায়, আর্য্যগণ তজ্জন্যই ঐ রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবল আবার ইহাপেক্ষাও দূরে গিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ—ভোজনান্তে নিবিষ্টমনা হইয়া যথাবিধি আচমন

(১) ত্রিভিঃ পঞ্চ ত্রিভিঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
অন্তেচ দ্বাদশ কুল্যান্ মুখশুদ্ধি র্বিধীয়তে॥

করিবে, মৃত্তিকা ঘর্ষণ দ্বারা মুখ ও হস্তদ্বয়ের শুদ্ধি সম্পাদন করিবে। এরূপ ভাবে আচমন করিবে যেন দন্তলগ্ন মল দূর হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে মল দন্তের সহিত এরূপ দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে তাহা সহজে কখনই দূর হইবার নহে, পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়া তাহা উঠাইতে যাইয়া তৃণ বেধাদি দ্বারা ব্রণ বা ক্ষত জন্মান কদাপি কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অশৌচ জন্মে; এমত স্থানে ঐ দন্তলগ্ন মলকে দন্তবৎ জ্ঞান করিয়া তাহা উদ্ধারের জন্য যত্ন করা হইতে বিরত থাকাই উচিত (১)। এইরূপ বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য যে কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা— কেবল পরিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা—তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুধু ইহাও নহে, মুখাভ্যন্তরের এই রূপ পরিষ্কৃতির উপর দন্ত, দন্তমূল, মাঢ়ি (gum) প্রভৃতির সুস্থতাও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত কারণেই আচমন সম্বন্ধে ঐরূপ কঠোর বিধান বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(১) ভুক্তাচামেৎ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখ হস্তৌচ মৃদাভির্ঘর্ষণৈরপি॥
ভোজনে দন্তলগ্নানি নিহৃত্যাচমনঞ্চরেৎ।
দন্তলগ্ন মসংহার্য্যা লেপমন্যেত দন্তবৎ॥
নতত্র বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্ন মুদ্ধারণে পুনঃ।
ভবেদশৌচ মত্যর্থং তৃণ বেধাদব্রণে কৃতে॥
আচার রত্নাকর

আচমনান্তে পাদশত গমন, বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎকাল শয়ন, তাম্বুলাদি মুখবাসন-দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি আরও কতিপয় বিধান আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উঁহাদেরও মূলে বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু, আমরা পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য সমালোচনে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তাই আর প্রস্তাববাহুল্য না করিয়া অন্যান্য যামার্দ্ধকৃত্যের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আর্য্যজীবনের প্রথম খণ্ডের উপসংহার করিব।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধকৃত্য।

ইতিহাস পুরাণ শ্রবণ প্রভৃতি এই দুই যামার্দ্ধের অনুষ্ঠেয় বিষয়। ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের কারণ নাই, সুতরাং সমালোচনা দ্বারা তাহার যুক্তিসিদ্ধতা সপ্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয়।

অষ্টম যামার্দ্ধ কৃত্য।

লৌকিক চিন্তাকরণ এবং সায়ং সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি এই যামার্দ্ধের করণীয় কার্য্য। ইহার কিয়দংশ পরিবার নীতি এবং সমাজ নীতি সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে এবং অপরাংশ ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে।

রাত্রি কৃত্য।

সংক্ষেপ-বিবৃতির জন্য আমরা রাত্রিকৃত্য নিচয়কে ক্রমিক সংখ্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

১। ইষ্টদেবতামন্ত্রজপ প্রভৃতি। ইহার কোন উপযোগিতা আছে কিনা তাহা ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচিত হইবে।

২। বিদ্যাভ্যাস। উপনয়নান্তর-কর্ত্তব্য বিদ্যাভ্যাস সমালোচন স্থলে সমালোচ্য।

৩। ভোজন। এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান দিবা-ভোজনের অনুরূপ।

৪। শয়ন। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বিধান আছে।

(ক) ভূমিতে শয়ন না করিয়া পবিত্র স্থানে খটোপরি শয়ন করিবে।

(খ) অন্য-সময়ব্যবহৃত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শয়ন না করিয়া শয়নার্থ-নির্দ্দিষ্ট বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শয়ন করিবে।

(গ) শিরোদেশে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত করিবে।

(ঘ) হস্তপদ এবং মুখ প্রক্ষালন করিবে।

(ঙ) উত্তর বা পশ্চিমশিরা শয়ন না করিয়া পূর্ব্ব বা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিবে।

(চ) শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি। ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে এই স্থানেই কিছু বলা আবশ্যক।

(ক) ভূমিতে শয়নে ভূমির আর্দ্র্তা শরীরে প্রবেশ করিয়া পীড়াজনক হইতে পারে। নানারূপ কীট ও সর্পাদির দংশনের আশঙ্কা আছে। খট্টোপরি শয়নে এই সব আশঙ্কা বহুপরিমাণে তিরোহিত হয়।

(খ) কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিবার সময় যেরূপ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক, বিশ্রাম কালে তদ্রূপ বস্ত্র পরিধান উপযুক্ত নহে, তাই শয়নার্থ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান কর্ত্তব্য।

(গ) নিদ্রাকালে হস্ত পদাদি শারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় নিশ্চেষ্ট থাকে, কিন্তু মন তখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না, তখনও স্বপ্নাদি আকারে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই ক্রিয়া নিবন্ধন মস্তিষ্কের দিকে কিঞ্চিৎ রক্তাধিক্য জন্মে। এই রক্তাধিক্য সাধারণতঃ নিতান্ত অল্প মাত্রায় জন্মে বলিয়া আমরা তাহার অপকারিতা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যদি ঘটনাবিশেষের বলে চিন্তার স্রোতঃ অধিক মাত্রায় বহিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ রক্তাধিক্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, এমন কি কখন কখন কাহারও স্বপ্নভ্রমণ (Somnambulism) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শিরোদেশে শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইলে উহার শীতল গুণযুক্ত জলীয় পরমাণু সকল কিয়ৎ পরিমাণে মস্তিষ্কে লব্ধপ্রবেশ হইয়া উহার স্বাভাবিক ভাব সংরক্ষিত এবং উগ্রতা প্রশমিত রাখিতে পারে। প্রথম প্রথম এইরূপ শৈত্যসংস্পর্শে অপকারের সম্ভাবনা থাকিলেও দীর্ঘ দিন

ব্যবহারে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া তিরোহিত হয়।

(ঘ) শয়নের পূর্ব্বে হস্তপদ এবং মুখ প্রক্ষালন করিলে শরীর পবিত্র বোধ হয়, মনের একাগ্রতা জন্মিবার বিশেষ সাহায্য হয়, সুতরাং সুনিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা হয়।

(ঙ) কেহ কেহ বলেন পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে চুম্বক লৌহের খনি বিদ্যমান আছে, উত্তর শিয়রে শয়ন করিলে মস্তিষ্কের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই চুম্বকের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া ভাবান্তরবিশেষের উৎপাদন করে। আবার পশ্চিম শিয়রে শয়ন করিলে পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখাবর্ত্তন নিবন্ধন শরীরস্থ রক্তরাশির গতির বিশৃঙ্খলাবিশেষ জন্মিতে পারে। কিন্তু এই "ভাবান্তর বিশেষ" এবং "বিশৃঙ্খলাবিশেষ" সত্য সত্যই হয় কি না এবং হইলেও উহার প্রকৃতি এবং মানব শরীরের সহিত উহার সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা অদ্যাপি উত্তমরূপে নির্ণীত

(চ) ঈশ্বরের নামস্মরণ। ধর্ম্মনৈতিক পরিচ্ছেদে সমালোচ্য।

আর্য্য পুরুষের দৈনন্দিন-কর্ত্তব্য সমালোচনায় আমরা আর্য্যজীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম। তাঁহার দশসংস্কারের সমালোচনায় ইহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উপসংহার করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৫	করুণা	করুণ
৩	৪	তৎস মস্তকে	তৎসমস্তকে
৩	১৩	শ্রবন	শ্রবণ
৩	২২	প্রতিজ্ঞার	প্রতিজ্ঞার
৪	১৬	হুতাসনে	হুতাশনে
৫	২২		সাচরন্
১৭	২২	বাস্তাণি	বাস্তানি
৩১	১৫	অকৃতি	আকৃতি
৩২	২০	হিতৈষণা	হিতৈষিণা
৫৯	৯	আদিদেবতা	অধিদেবতা
৫৯	১৪	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
৫৯	২১	ময়াদিদেব	ময়াধিদেব
৫৯	২৪	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
৬৩	২৪	সখিতাঙ্গো	সখীতাঙ্গো
৬৮	[illegible]	[illegible]	অর্থাৎ
৬৯	১০	অথবাবাক	অথাবক্রম্য
৬৯	১২	দশঃ	দশ।
৬৯	১৩	উভয়	উভয়োঃ
৬৯	১৮	দেয়া	দেহা
৭০	১৯	অন্তর্জল	অন্তর্জলা
৭০	২০	ন	না
৭২	১৯	একা	একাং
৭২	১৯	দত্বা	দদ্যাৎ
৭২	২০	উভয়হস্তয়ো দেতু	উভয়োর্হস্তয়োর্দেহে চ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৭৯	১৯	ভবত্যাপয়ত্তো	ভবত্য প্রযুক্তো
৮০	২০	ক্ষীরিণো	ক্ষীরিণো
৮৭	২৬	কুর্ম্ম	কূর্ম্ম
৮৯	২১	উষস্থ্যসি	উষস্থ্যসি
৯৪	১৫	পরমাণ	পরমাণু
৯৮	৪	সম্ভুত	সম্ভূত
১১৫	৪	নিয়মানিবর্ত্তী	নিয়মানুবর্ত্তী
১১৬	৭	বিবর	বিবরণ
১৩৫	৩	প্রকাষ্ঠে	প্রকোষ্ঠে
১৩৬	২৬	রত্না ক	রত্নাকর
[illegible]	২৩	ভুগ	ভৃগু
১৩৮	২৫	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠ
১৩৯	২১	চাতিবি	চাতিথি
১৪০	১৪	পুংসাং	পুংসাং
১৫৭	২১	যত্তো	যত্তো
১৫৮	১৩	মন	মনে
১৮১	১৬	দেবস্বঃ	দেবস্বং
১৯৯	১৫	স্ফর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি